২০০৩

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ❑ ১০ তম সংখ্যা

৩০ নভেম্বর, ২০০৩ ঈসাব্দ

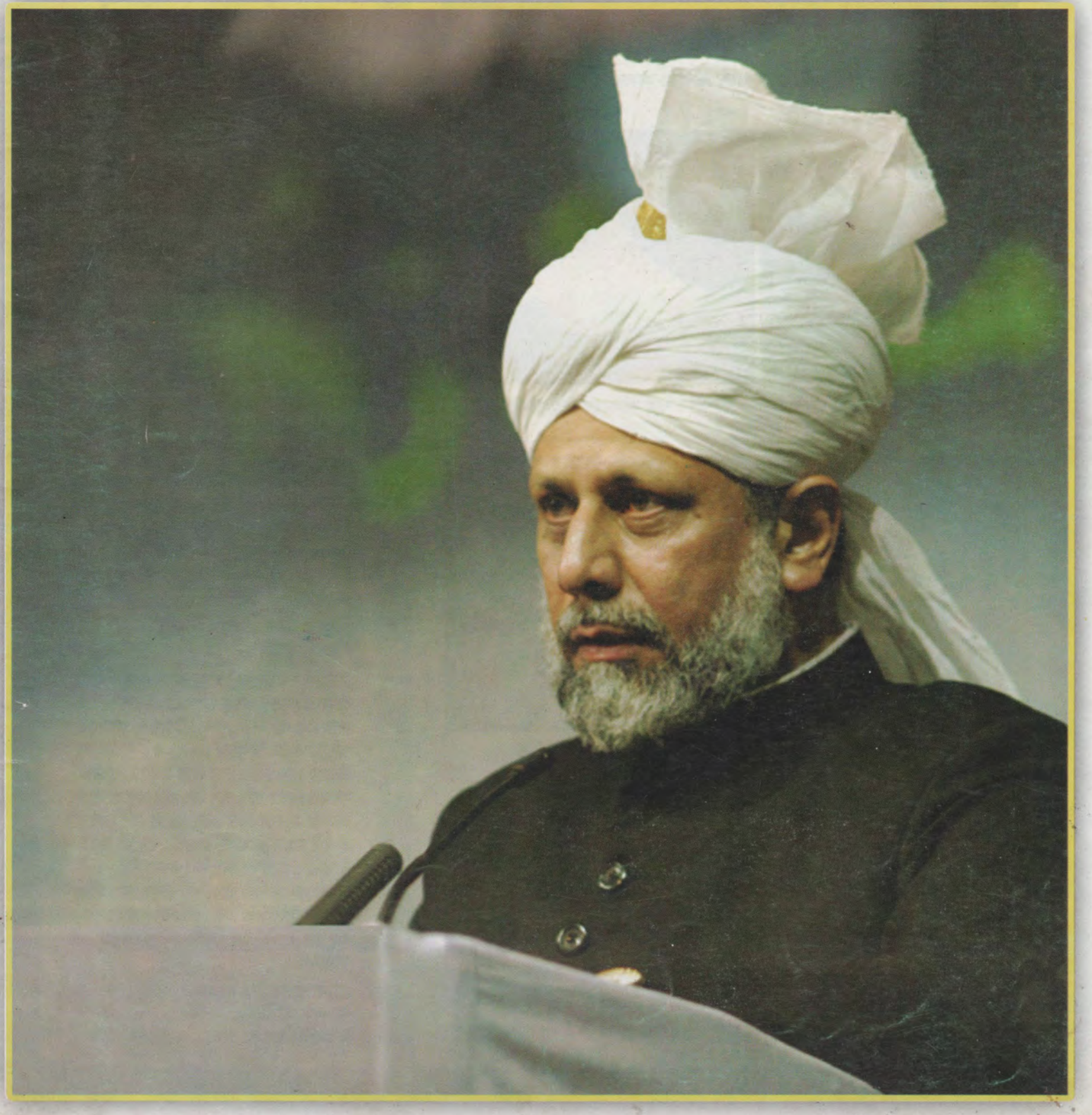

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

শহীদ শাহ আলমের নামাযে জানাজা আদায়ের দৃশ্য

রঘুনাথপুরবাগ আহমদীয়া মসজিদ

শহীদ শাহ আলমের চেহারা মোবারক

সমবেদনা জানাতে শহীদ পরিবার ও রঘুনাথপুরবাগ জামাতের সদস্যদের মাঝে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব

সাম্প্রতিক আহমদীয়া বিরোধী সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্দের দাবীতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলন

বর্তমান সময়ে করণীয়

ধর্মের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বিরোধী শক্তি সর্বদাই সত্যাকে পদদলিত করার নানা প্রকার ছল-চাতুরীর আশ্রয়ে ইলাহ জামাতের বিনাশ সাধনের চেষ্টা করেছে। ইদানিংকালে আমাদের ভাই শাহ্ আলম সাহেবের শাহাদত নিয়ে আমরা মুখ খুলে বলতে পারলাম না অথচ এর আগেই আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে আমাদের কোন কোন চিহ্নিত বিরোধী পক্ষ বা গোষ্ঠী বিক্ষোভ মিছিল করে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকী দিয়েছে। আমরা নির্যাতিত ও নিপীড়িত। আমাদের লোক শহীদ হয়েছে। কোথায় আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনার কথা বলবো আর সেখানে আমরাই হচ্ছি হুমকীর সম্মুখীন। তকদীরের নির্মম পরিহাস। আমাদের লোকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাও দেয়া হচ্ছে।

আমাদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করার লক্ষ্যে বিরোধীদের এ দাবী নতুন নয়। মানবতা তথা দেশের পবিত্র সংবিধান বিরোধী এ দাবী এমন কি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-এর শিক্ষার বিরোধী এ দাবী এদেশের জনগণ এর আগেও প্রত্যাখ্যান করেছে। আমরা আশা করি আমাদের সদাশয় সরকার ও জনগণ বিবেকসম্পন্ন এবং সচেতন। এ দাবী অতীতের ন্যায় আবারও প্রত্যাখ্যাত হবে।

তবে এ প্রেক্ষিতে ইলাহী জামাত হিসেবে আমাদের কী করণীয় তা ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বয়স প্রায় ১১২ বছর। যখনই আমাদের বিরোধীরা উত্তপ্ত হয়েছে তখন জামাত আল্লাহ্র আশ্রয়ের চায়াতলে ঠাঁই নিয়েছে। জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ "শত্রু যখন বিরোধিতায় বেড়ে গেলো আমরা তখন আমাদের প্রিয় প্রভুর আঁচলের নীচে লুকিয়ে গেলাম।"

সুতরাং বিরোধিতার অগ্নিশিখা যতই উত্তপ্ত করা হোক না কেন, শত্রুরা যতই অপকৌশল অবলম্বন করুক না কেন আমরা আমাদের পরম প্রিয় প্রভু আল্লাহ্র আঁচলের নীচে ঠাঁই নিব। আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) বর্তমান সময়ে আমাদেরকে নিম্নোক্ত দোয়াটি বেশি বেশি পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া নাআউযুবিকা মিন শুরুরিহিম

এ ছাড়াও সময়োপযোগী আরও অনেক দোয়া রয়েছে। জামাতের আবাল -বৃদ্ধ-বণিতা সকলে যেন রীতিমত এ দোয়াগুলো পাঠ করেন, দুরূদ ও ইস্তগফার বেশি বেশি পাঠ করেন এবং জামাতের হেফাযত ও ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের জন্যে ধৈর্যের সাথে দোয়া অব্যাহত রাখেন। সদকা-খয়রাতও বেশি বেশি দেন যাতে আল্লাহ্র করুণা আকর্ষিত হয়। যে খোদা একশ' বছরের বেশি সময় ধরে এ ঐশী জামাতকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়েছেন তিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব খোদা, তিনি এখনও তাঁর আত্মাভিমান দেখাবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রয়োজন আমাদের সংশোধনের এবং বেশি বেশি আল্লাহ্র প্রতি রুজু হওয়ার। ওয়াল্লাহু খায়রুন হাফীযুন। আল্লাহ্ উত্তম সুরক্ষাকারী।

মোবাশ্শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ॥ ১০ম সংখ্যা

১৬ অগ্রহায়ণ ১৪১০ বঙ্গাব্দ ৫ শওয়াল ১৪২৪ হিঃ কাঃ
৩০ নবুওয়ত ১৩৮২ হিঃ শাঃ ৩০ নভেম্বর, ২০০৩ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে L 50/ $ 100

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
ন, ন, মোহাম্মদ সালেক	-	কানাডা
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ডাঃ মাহবুবুল ইসলাম	-	অষ্ট্রেলিয়া
সৈয়্যদ মোহাম্মদ রেজা শাকিল	-	ফ্রান্স

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ. কে. মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫

E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

সব্‌র করুন!

'সব্‌র' একটি আরবী শব্দ। অভিধানে এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণিত হয়েছে যেমন ঃ (১) পরম সাহসিকতার সাথে দুঃখ-যাতনা সহ্য করা, (২) আত্মাকে এমন জিনিষ থেকে বিরত রাখা যা থেকে শরীয়ত এবং বিবেক-বুদ্ধিও বিরত থাকতে আদেশ দেয়, (৩) রোযাকেও সব্‌র বলা হয়েছে। এজন্যে যে, এ ও এক সব্‌রের অবস্থা, (৪) সাহস ও শৌর্য, (৫) ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করা, (৬) শেষ মাথা পর্যন্ত যাওয়া, (৭) শক্ত পাথর ইত্যাদি। এক প্রকার তিক্ত গাছকেও বলা হয় সব্‌র। এ সকল অর্থে সব্‌র একজন মানুষকে করে তোলে মহিয়ান ও গরিয়ান।

সব্‌র বা ধৈর্য একটা মহৎ গুণ। যেসব গুণ থাকলে মানুষ সফলতার উচ্চ মার্গে আরোহণ করতে পারে সব্‌র বোধ করি এদের মাঝে সর্বোচ্চ স্থানে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও ধর্মীয় জীবনের যেকোন পর্যায়ে সফলতা লাভ করতে হলে থাকা চাই ধৈর্য নামক পরম গুণ। ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে এ গুণের অনুশীলনের অত্যাবশ্যকতার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ধর্মীয় ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই, নবী-রসূল ও তাঁদের অনুসারীগণ উত্তাল তরঙ্গসম যুলুম ও অত্যাচারের ভয়াল গিরিবর্ত লংঘন করেছেন কেবলমাত্র ধৈর্য গুণের অনুশীলনের মাধ্যমে। এক লাখ চব্বিশ হাজার নবীর জীবন পরম ধৈর্যের স্বাক্ষর বহন করে চির অম্লান হয়ে রয়েছে। নবীদের জামাতও এ যুলুম-অত্যাচার থেকে নিস্তার পায় নি। মুসায়ী মসীর অনুসারী আমাদের পূর্ববর্তী জাতি ঈসায়ীগণকে ঈমান আনার কারণে লোহার চিরুনী দিয়ে তাদের গায়ের মাংস আঁচড়িয়ে ফেলা হয়েছে, ক্ষুধার্ত বাঘের সম্মুখে ক্ষুধার্ত ঈমানদারকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে কেবল বাঘের মানব ভক্ষণের ভয়াবহ দৃশ্যকে উপভোগ করার জন্যে। যুগে যুগে এ যুলুম অত্যাচার করা হয়েছে তথাকথিত ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে। আর চিরদিনই মু'মিনগণ নীরবে তা সহ্য করে আল্লাহ্‌র মহান আশিস ও কল্যাণে ভূষিত হয়েছেন। আমাদের পরম প্রিয় ও মহিমান্বিত নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর জীবনের কথাই ধরা যাক। তিনি এবং তাঁর অনুসারীগণ দীর্ঘ তেরটি বছরের মক্কী-জীবনে যে অসাধারণ ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন ইতিহাসের পাতায় তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। বর্তমান যমানায় আল্লাহ্‌তাআলার তৌহীদ অর্থাৎ **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** কলেমাকে সারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে জামাত দাঁড়িয়েছে এ-ও এর জন্ম লগ্ন থেকে স্বরের পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের প্রিয় দেশমাতৃকার প্রায় ১৩ কোটি মানব সন্তানকে আহ্‌মদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের আলোকে আলোকিত করার লক্ষ্যে আমাদেরকে চরম যুলুম-নির্যাতন সয়েও সব্‌রের পরীক্ষা দিতে হবে নিঃসন্দেহে। আমরা তাতে একটুও পিছ পা হবো না। আহমদীয়তের এ বিজয়ের শতাব্দীতে এই বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে আমাদেরকে সত্যের মশাল হাতে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে। মহান আল্লাহ্ অতীতে যেভাবে তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন, সেরূপ সাহায্যের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূলধন করে আমরা ইনশাআল্লাহ্ দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র মহান কাজে এগিয়ে যাবো। এতে আমাদেরকে যত শাহাদতের পেয়ালাই পান করতে হয় তাতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

- নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কুরআন মাজীদ ঃ সূরা আল্ আনআম - ৮	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
হাদীস শরীফ ঃ মৃত্যুর স্মরণ	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩
অমৃত বাণী ঃ চশমায়ে মসীহী ঃ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ আজিম উদ্দীন	৪
জুমুআর খুতবা ঃ ইমাম নিরাপত্তার ঢালস্বরূপ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৯
মসীহ্ (আঃ) হিন্দুস্তান মেঁ মূল ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	১০-১১
মূলাকাৎ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ সংকলন - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১২-১৪
ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ)	ঃ সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ - প্রফেসর মোহাম্মদ আমীর হোসেন	১৫
সংকলন ঃ দুর্জনেরে হানো	ঃ জনাব মনজুরে মাওলা	১৬
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)	ঃ মাওলানা মাহ্মুদ আহমদ	১৭-১৮
সেই রক্তাক্ত শাহদত বরণের ঘটনা	ঃ জনাব আমীর মাহ্মুদ ভূঁইয়া	১৯-২০
যাকাত ও আল্লাহ্র পথে ব্যয়	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২১-২২
কবিতা ঃ জাগ্রত বিবেকের কাছে নিবেদন	ঃ মৌঃ নাসের আহমদ আনসারী	২২
ছোটদের পাতা ঃ এসো কুরআন শিখি	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৩
নতুনদের পাতা ঃ		
● হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রাঃ)- দানশীলতা	ঃ জনাব লুৎফর রহমান তাহের	২৪-২৫
● প্রকৃত মুসলমান কে বা কারা?	ঃ মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন	২৬-২৭
বিরুদ্ধবাদীগণ কর্তৃক মিথ্যা দোষারোপের বিরুদ্ধে আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা	ঃ	২৮
কবিতা ঃ ● শহীদ শাহ্ আলম স্মরণে ● শারাবান তাহুরা	ঃ জনাব মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার ● জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়	২৯
● পুণ্য-গাথা	ঃ জনাব মির্যা আলী আকন্দ	২৯
সংবাদ	ঃ	৩০-৩২

প্রচ্ছদ ঃ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাস্রূর আহমদ (আইঃ)

কালামুল ইমাম

"হ্যাঁ, একটা কথা মনে রাখতে হবে, এবং তা কখনও ভুলে গেলে চলবে না যে, যদিও আমি নবী ও রসূল নামে আখ্যায়িত হয়েছি, তথাপি খোদাতা-আলার তরফ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে যে, তাঁর এসব আশিস ও কল্যাণ আমার প্রতি প্রত্যক্ষভাবে হয় নি বরং আসমানে এক পবিত্র সত্তা আছেন যাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ আমার মাঝে ক্রিয়াশীল হয়েছে অর্থাৎ মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের। তাঁর উসিলা ও মধ্যস্থতা অক্ষুণ্ন রেখে এবং তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে তাঁর মুহাম্মদ ও আহমদ নামে অভিহিত হয়ে আমি রসূলও হয়েছি অর্থাৎ প্রেরিতও হয়েছি আর খোদার কাছ থেকে অদৃশ্যের বা গায়েবের সংবাদ লাভকারীও হয়েছি। এবং এর দরুন খাতামান্নবীঈনের মোহরও অক্ষুণ্ন রয়েছে। কেননা, আমি প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বরূপে প্রেমের আয়নায় সেই নাম লাভ করেছি" [ইমাম মাহ্দী (আঃ) প্রণীত **এক গলতি কা ইজালা** পুস্তক]

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত না হতাম, এবং তাঁর গোলাম ও অনুসারী না হতাম, অথচ আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন যদি দুনিয়ার সমস্ত পর্বতের সমানও হতো, তথাপি আমি কখনও খোদার সাথে বাক্যালাপ কিংবা তাঁর বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম না। কেননা, এখন মুহাম্মদী নবুওয়ত ছাড়া বাকী সব নবুওয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোনও শরীয়তবাহী নবী আসতে পারে না। কিন্তু শরীয়ত ছাড়া কোন নবী আসতে পারবেন, অবশ্য তিনি যদি রসূলে করীম (সঃ)-এর অনুসারী হন। এভাবে আমি একই সঙ্গে একজন উম্মতিও, একজন নবীও। আমার নবুওয়ত হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়ত বাদ দিয়ে আমার নবুওয়তের কোনও অস্তিত্ব নেই। এটা তো সেই মুহাম্মদী নবুওয়তই যা আমার মাঝে প্রকাশিত হয়েছে" [হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) প্রণীত **তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া** পুস্তক]

বিশেষ ঘোষণা

হুযূর আকদস (আইঃ) ২০/১১/২০০৩ইং তারিখের ফ্যাক্স বার্তা মোতাবেক **জনাব আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব**, সাবেক ন্যাশনাল আমীর এবং **জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব**, সাবেক নায়েব ন্যাশনাল আমীর ২য়-কে পূর্বে আরোপিত শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আল্লাহ্তাআলা তাঁদেরকে ক্ষমা করুন। এবং জামাতের সেবা করার তৌফীক দিন।

মোবাশ্শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর

কেন্দ্রীয় সালানা জলসার চাঁদা সত্বর আদায়ের অনুরোধ

আহমদীয় মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ৮০তম কেন্দ্রীয় সালানা জলসা আগামী জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জলসার সার্বিক কামিয়াবীর জন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সালানা জলসার চাঁদায় জলসার কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু এখাতে এখনও সন্তোষজনক চাঁদা আদায় হয় নি বলে জানা গেছে। সুতরাং স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাদেরকে এ চাঁদার আদায়গীর ব্যাপারে তৎপর হতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ এর মধ্যে যাতে প্রত্যেকের বাজেটকৃত চাঁদা আদায় হয় এবং যথাযথভাবে কেন্দ্রে পৌঁছে সেজন্যে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

সূরা আল্ আনফাল - ২

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। আর স্মরণ কর যখন তোমরা (সংখ্যায়) অল্প ছিলে, দেশে দুর্বল বলে গণ্য হতে। এবং লোকেরা তোমাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে বলে ভয় করতে, তখন তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন ও তাঁর সাহায্য দিয়ে তোমাদেরকে সমর্থন যোগালেন এবং তোমাদেরকে উত্তম সব রিযিক দান করলেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। ১১১২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না, নইলে ফলতঃ তোমরা জেনে-শুনে নিজেদের আমানতের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করতে আরম্ভ করবে।১১১৩

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং জেনে রাখ, 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি কেবল এক ধরনের পরীক্ষা, আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে এক মহা পুরস্কার।' ৩ রুকূ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٣٠﴾

৩০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের (অর্থাৎ ফুরকানের) অধিকারী১১১৪ করে নিবেন ও তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে নিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন; আর আল্লাহ্ মহা প্রাচুর্যের অধিকারী।

১১২। এখানে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌তাআলা যেমন তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন যখন তারা দুর্বল ছিল এবং চরম ক্ষতিকারক লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, তেমনিভাবে যখন তারা ক্ষমতার অধিকারী হবে তাদের কর্তব্য হবে দুর্বলকে রক্ষা করা। এ আয়াতের মাঝে এক ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে যে, মুসলমান জাতি শীঘ্রই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হবে।

১১৩। এ আয়াত মানবের দু'প্রকার আনুগত্যের কথা বলে, প্রথমতঃ আল্লাহ্‌তাআলার এবং তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্য যা শর্তহীন এবং চিরস্থায়ী, কারণ আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা এবং রসূল তাঁর প্রতিনিধি এবং দ্বিতীয়তঃ মানব জাতির প্রতি আনুগত্য যা তাদের প্রতিটি দায়-দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্ভুত হয়ে থাকে।

১১৪। 'ফুরকান' অর্থ (১) যা সত্য এবং মিথ্যা পার্থক্য করে দেখায়, (২) প্রমাণ বা সাক্ষ্য বা যুক্তি, (৩) সাহায্য বা বিজয় এবং (৪) প্রভাব (লেইন)।

হাদীস শরীফ

মৃত্যুর স্মরণ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٦﴾

অনুবাদ ঃ প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনেই কেবল তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। তখন যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হবে সে নিশ্চয় সফলকাম হবে। প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৬)

হাদীস ঃ

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমার কাঁধ ধরলেন ও বললেন, দুনিয়াতে এভাবে কাটাও যেন তুমি একজন মুসাফির।' ইবনে উমর (রাঃ) বলতেন, 'তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে সকালের অপেক্ষা (আশা) করো না এবং সকালে উপনীত হয়ে সন্ধ্যা বেলার অপেক্ষা করো না, সুস্বাস্থ্যের দিনগুলোতে রোগব্যাধির (দিনগুলোর) জন্য প্রস্তুতি নাও এবং জীবদ্দশায় মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করো' (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ

পবিত্র কুরআনের আয়াতে আমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরকালের কল্যাণ প্রাপ্তির কথা জানিয়ে দিয়েছে। যে ব্যক্তি পরকালের আযাব হ'তে রক্ষা পেল সে-ই প্রকৃত পক্ষে মুক্তিপ্রাপ্ত। একথা যে বুঝে ও জানে সে অবশ্যই নিজেকে মুক্তির পথে পরিচালিত করবে। তাই আল্লাহ্‌তাআলা তার বান্দাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তোমাদের প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আসলে যে ব্যক্তি তার মরণকে স্মরণ করে সে-ই পাপ হতে মুক্তি পেতে পারে।

হযরত রসূল করীম (সঃ) জানাচ্ছেন, পরকালের মুক্তির জন্য ও নিজেকে গুনাহ্ হতে সুরক্ষার জন্য এ পৃথিবীতে এক পথিকের ন্যায় জীবন যাপন করো। যেভাবে পথিক পথ চলার জন্য নিজেকে হালকা করে চলে, অহেতুক বোঝা ও ঝামেলা হতে মুক্ত হয়ে নিজের ভ্রমণকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে, ঠিক সেভাবে পরকালের ভ্রমণের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ইহকালে পার্থিব জগতের অহেতুক ঝামেলা হ'তে মুক্ত হওয়া প্রয়োজনীয়। যে ব্যক্তি পার্থিব ভোগ বিলাসকে মূখ্য মনে করে সে কখনও পরকালের স্বাচ্ছন্দ্যকে পাবে না।

আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) আরও জানাচ্ছেন, তোমরা কবরস্থানে যাও তা তোমাদেরকে মৃত্যু স্মরণ করিয়ে দিবে আর মৃত্যুর স্মরণ তোমাদেরকে পাপ হতে দূরে রাখবে।

আজ দুনিয়াতে যত পাপ অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে এর মূলে পরকালের উপর বিশ্বাস না থাকা। এসব পাপে যারা লিপ্ত তারা মনে করে না যে, একদিন তাদের হিসাব দিতে হবে।

তাই আমরা যদি নিজেদেরকে পাপ হতে মুক্ত রাখতে চাই, পরকালের স্বাচ্ছন্দ্য চাই তাহলে এর একমাত্র চাবি হলো নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করা ও একথা মনে রাখা যে, কর্মের হিসাব একদিন দিতেই হবে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবাইকে পরকালের স্বাচ্ছন্দ্য দান করুন ও সুপথে চলার শক্তি দান করুন, আমীন।

অনুবাদ - **মাওলানা সালেহ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

চশমায়ে মসীহী

(২০তম কিস্তি)

এরা খতমে নবুওয়তের ব্যাখ্যা করে যাতে হযরতের নবুওয়তই বাতিল হয়। হযরত (সঃ)-এর অনুসারী হলে যে সকল বরকত ও সম্পদ পাওয়া উচিত ছিল, সেগুলো এখন আর পাওয়া যায় না, সব বন্ধ হয়েছে। এখন খোদার সাথে বাক্যালাপের অভিলাষ ও আশা শুধু দুরাশা, এ কি খতমে নবুওয়তের অর্থ? লা'নাতাল্লাহি আল্লাল কাযেবীন। এমন হলে হযরতের অনুসারী হয়ে কী লাভ তা কি এরা বলতে পারেন? ধর্ম মত হিসেবে যাদের হাতে অতীত কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নেই। তাদের জন্য খোদার মা'রেফতের দ্বার অবরুদ্ধ। কিন্তু ইসলাম জীবন্ত ধর্ম। কুরআন শরীফে সূরা ফাতিহাতে খোদাতাআলা মুসলমানদিগকে পুরাতন পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) সাব্যস্ত করেছিলেন। পুরাতন নবীগণকে যে সকল সম্পদ দেয়া হয়েছিল, তদসমুদয় লাভ করার প্রার্থনা শিখিয়েছেন। শুধু গল্প-কাহিনীই যাদের সম্বল তারা কীরূপে নবীগণের ওয়ারিশ বলে গণ্য হবে? দুঃখের বিষয় তাদের সামনে সকল বরকত ও সম্পদের ফোয়ারা ফুটে উঠেছে কিন্তু তারা এক ঢোকও পান করে না।

আবার আমি মুল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে বলছি, মুক্তির উৎপত্তিস্থল প্রেম ও জ্ঞান। জ্ঞানের প্রকৃতি এই যে, জ্ঞান বৃদ্ধির অনুপাতে প্রেম বৃদ্ধি হয়। সৌন্দর্য বা উপকার লাভ প্রেমোচ্ছ্বাসের মূল কারণ। যখন মানুষ জ্ঞান অর্জন করতঃ ঐশ্বরিক সৌন্দর্য ও উপকারিতা বুঝতে পারে যে, তার পরমেশ্বর আপন অসীম ব্যক্তিগত সৌন্দর্যে কত সুন্দর ও তাঁর অনন্ত উপহার তাকে সবদিকেই কেমন পরিবেষ্টন করেছে তখন মানবাত্মায় নিহিত স্বাভাবিক ঈশ্বরপ্রেম তরঙ্গায়িত ও উথলিত হয় এবং সে খোদাতাআলাকে সর্বাধিক সৌন্দর্যাধার ও অবিরাম সর্বাধিক উপকারদাতা গুণাকর দেখে সর্বাধিক ভালবাসে (১)। সে তখন শুধু বাক্যে সীমাবদ্ধ না করে কার্যতঃ ও বাস্তবিকই তাঁকে একমাত্র অদ্বিতীয় প্রিয়তম বলে জ্ঞান করে, তদীয় চরিত্র ও সুষমায় আসক্ত হয়। ঈশ্বর প্রেমের বীজ মানব স্বভাবে চির-নিহিত তবুও শুধু ঈশ্বর-জ্ঞানই উক্ত বীজে জলসেচন ও রসপ্রদানে সমর্থ। কোন প্রিয়জনই জ্ঞান, রূপ, সৌন্দর্য বিকাশ, সৎ স্বভাব ও সম্মিলন ব্যতীত প্রেমিকের মনাকর্ষণে সক্ষম হয় না। পূর্বজ্ঞান লাভ হলেই ঐশ্বরিক প্রেমের সমুজ্জ্বল অগ্নিশিখা মানব হৃদয়ে অকস্মাৎ পতিত হয়ে খোদাতাআলার দিকে তাকে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে। তখন মানবাত্মা প্রেমসুলভ বিনয় ও নম্রতাসহ অনন্ত অনাদি প্রিয়তমের দ্বারদেশে পতিত হয়ে একত্ববাদ ও তৌহীদের অকুল সাগরে ঝাঁপ দেয় এবং তদ্বারা এত নির্মল ও পবিত্র হয় যে, সমুদয় সাংসারিক অপবিত্রতা ও স্থূলতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়- তার অন্তর মহা জ্যোতির্ময় পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়। তখন খোদাতাআলা যেমন কুকর্ম ও কুকথা ঘৃণা করেন তেমনি সে-ও কুকর্ম ও কুকথা ঘৃণা করে। খোদার সন্তোষই তার সন্তোষ হয়, খোদা যাতে রাজী থাকেন সে-ও তাতেই রাজী থাকে। (চলবে)

---

(১) বহুবার আমি লিখেছি যে, ওহী, আকাশবাণী অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের বাক্যালাপ, সাদর সম্ভাষণ, আকাশবাণী-লব্ধ অসাধারণ নিদর্শন ব্যতীত (যা তাঁর ঈশ্বরের সুস্পষ্ট প্রমাণ) খোদাতাআলার পুর্ণজ্ঞান কখনও পাওয়া যায় না। যে জ্ঞানের নিমিত্ত জ্ঞানার্থীর তীব্র ক্ষুধা ও পিপাসা হয় তা-ই জ্ঞান। যে জ্ঞানাভাবে সে মৃত ও প্রাণহীন হয় তা-ই জ্ঞান। এমন জ্ঞান কি ইসলাম ধর্মে মজুদ নেই। এটা কি নির্জীব ও নিরস ধর্ম? ইসলামই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম। শুধু এটাই আপন অনুসারীদেরকে জীবন প্রদানে সক্ষম। শুধু এতেই ইহলোকে ঈশ্বর দর্শন সম্ভবপর। এরই আশীর্বাদে আমরা ইলহাম ও আকাশবাণী প্রাপ্ত হই। পৃথিবীর অন্যান্য প্রত্যেক ধর্মই জীবনবিহীন, আশীর্বাদবিহীন, মঙ্গলবিহীন, আলোক বিহীন। পর-ধর্ম মতে জীবন যাপন করে খোদার সাথে বাক্যালাপ করতে পারি না, তাঁর অলৌকিক কার্য্য দর্শন করতে সমর্থ হই না- এ সকল সম্পদ ও বরকত নিয়ে কেউ কি আমাদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সাহসী হবেন?

অনুবাদ - মোহাম্মদ আজিমউদ্দীন

চলিতকরণ ও সম্পাদনা - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বিশেষ দোয়া এলান

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট এক বার্তায় বর্তমান সময়ে জামাতকে বেশি বেশি সংখ্যায় নিম্নোক্ত হাদীসের দোয়াটি পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ـ (ابوداؤد كتاب الصلوة)

(আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা তোমাকে তাদের (অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের) মোকাবেলায় (ঢাল স্বরূপ) রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি (আবূ দাউদ; কিতাবুস্ সলাহ্)।

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

ইমাম নিরাপত্তার ঢালস্বরূপ

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাস্‌রূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১১ জুলাই, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পরে হুযূর (আইঃ) সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে খুতবা দিয়েছেন ঃ

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٢﴾

অনুবাদ ঃ "এবং (স্মরণ কর) যখন তুমি তোমার পরিবারের কাছ থেকে ভোর বেলায় বেরিয়েছিলে, তুমি মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য যথাস্থানে মোতায়েন করছিলে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" (সূরা আল ইমরান ঃ ১২২)।

এ আয়াত উহুদের যুদ্ধ সম্বন্ধে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের একটি ভুল হয়েছিল। যুদ্ধের আরম্ভে একদল মুসলমান যুবক আঁ হযরত (সঃ)-এর ইচ্ছার বিপরীত পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, মদীনার বাইরে গিয়ে এ যুদ্ধে লড়াই করা উচিত হবে। তারপর উহুদের মাঠে এক গিরিপথের মুখে পঞ্চাশজন তীরন্দাজ সাহাবীকে পাহারায় নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারা দেখলেন, যুদ্ধের অবস্থা মুসলমানদের পক্ষে চলে গেছে, বিজয় লাভ হতে চলেছে। আঁ হযরত (সঃ)-এর নির্দেশ ছিল, তোমরা কোন অবস্থাতেই এ গিরিপথ ছেড়ে যাবে না। তা সত্ত্বেও তারা মালে গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে আঁ হযরত (সঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করে গিরিপথ ছেড়ে চলে এসেছিলেন। ফলে যা হবার ছিল তা হ'ল অর্থাৎ মুসলমানদের ক্ষতি হ'ল। এ সম্পর্কে আঁ হযরত (সঃ)-কে পূর্বেই স্বপ্নযোগে জানানো হয়েছিল যে, এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং মুসলমানদের ক্ষতি হবে। এ কথা স্পষ্ট যে, আঁ হযরত নিশ্চয় যুদ্ধের পূর্বে অনেক দোয়াও করেছিলেন। বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক বিবরণও পাওয়া যায়। যাক, আল্লাহ্তাআলা আঁ হযরত (সঃ)-এর দোয়া শুনেছিলেন এবং সেই অবস্থার যে ফলাফল প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল তা বড়ই ভয়ংকর হতে পারত। যখন মুসলমানরা জয়লাভ করেছিলেন দেখে সেই গিরিপথের হেফাযতে নিয়োজিত সাহাবায়ে কেরাম আদেশ অমান্য করে গিরিপথ ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফলে শত্রুপক্ষ পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ করেছিল এবং মুসলমানদের

অনেক বড় ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতি বড়ই ভয়াবহ হতে পারত। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ)-এর দোয়ার পরও মুসলমানদের বিরাট ক্ষতি তো হোল; কিন্তু শত্রুদের যতবড় বিজয় লাভের কথা ছিল তা তারা করে নি। সাহাবায়ে কেরাম অনেকে শহীদ হয়েছেন। স্বয়ং আঁ হযরত (সঃ) বড় আঘাত পেয়েছেন; কিন্তু শত্রুরা বিজয় বেশে ফেরত যেতে পারে নি। কারণ সে যুগে যুদ্ধের রীতি ছিল বিজয়ীরা প্রচুর মালে গনীমত পেয়ে যেত, তারপর লুট মার করত, এ ক্ষেত্রে তারা এর কিছুই করতে পারে নি।

এর ব্যাখ্যায় হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাজির একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি। তিনি লিখেছেন ঃ ওয়া ইয গাদাওতা মিন আহলিকা ... (সূরা আলে ইমরান ঃ ১২২) এর পূর্বে আল্লাহ্ বলেছেন, ইন তাস্‌বিরু ওয়া তাত্তাকু ... অর্থাৎ যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তাকওয়ার উপর দাঁড়িয়ে থাক, তাহলে তাদের প্রচেষ্টায় তারা তোমাদেরকে কোন ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। এখানে আল্লাহ্তাআলা তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। কিন্তু উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা তো যথেষ্ট ছিল, কিন্তু যখন তারা আঁ হযরত (সঃ)-এর আদেশ অমান্য করেছে তখন তারা পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। অথচ বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা সংখ্যায় খুব অল্প হয়েও আঁ হযরত (সঃ)-এর আনুগত্যের বরকতে শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করেছিলেন।

(উহুদে) পরাজয়ের এটিও একটি কারণ ছিল যে, আব্দুল্লাহ্ বিন ওবাই বিন সলুল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নিজের লোকদের নিয়ে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মুনাফিকদের উপর বিশ্বাস করা উচিত নয় (তফসীরে কবীর; ইমাম রাজি)।

"হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তফসীরে কুরআনের ভূমিকায় এ বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) লিখেছেন,

"শত্রুরা বদরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালাবার সময় ঘোষণা করেছিল যে, আগামী বছর তারা প্রতিশোধ নিতে মদীনার উপর আক্রমণ করবে। অতএব সে মতই তারা পরের বছর প্রস্তুতি নিয়ে মদীনার উপর আক্রমণ করতে এসেছিল। মক্কাবাসীর ক্রোধ এতটা ছিল যে, তারা বদরে পরাজয়ের পরেই ঘোষণা করেছিল, যাদের লোক বদরে মারা গেছে তারা নিজেদের মৃত আত্মীয়দের স্মরণে কাঁদতে পারবে না। এরপর থেকে যে সব বাণিজ্যিক কাফেলা ব্যবসায় করে ফিরবে তাদের উপার্জিত টাকা পরবর্তী যুদ্ধের জন্য জমা করে রাখতে হবে। এভাবে বড় প্রস্তুতি সহকারে তিন হাজারের বেশি সৈন্য সংখ্যার একটি বাহিনী আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদীনার উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। আঁ হযরত (সঃ) সাহাবায়ে কেরামের মতামত নিলেন যে, আমরা কি যুদ্ধের জন্য মদীনা শহরে থেকে অবস্থান গ্রহণ করব, না কি মদীনার বাইরে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করব? আঁ হযরত (সঃ) পসন্দ করছিলেন যে, মুসলমানরা মদীনার ভেতরে নিজ নিজ গৃহে থেকে সহজে শত্রুর মোকাবেলা করতে পারে এবং এভাবে যুদ্ধের অবতারণা করার দায়ভারও শত্রুর উপরে থাকবে। কিন্তু অনেক মুসলমান যারা বদরের যুদ্ধে শামিল হতে পারে নি; যাদের মনে আপেক্ষ ছিল, হায়! আমরা যদি যুদ্ধে শামিল হয়ে আল্লাহ্র পথে শহীদ হবার সুযোগ নিতে পারতাম; এরা বেশি উৎসাহ দেখাল এবং জোর দিল যে, আমাদের শহীদ হবার সুযোগ থেকে কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে? অতএব আঁ হযরত (সঃ) তাদের কথা মেনে নিলেন। সাথে নিজ স্বপ্নের কথাও শোনালেন, 'আমি গাভী দেখেছি।

আমি দেখেছি যে, আমার তরবারির মাথা ভেঙ্গে গেছে এবং আরও দেখেছি, গাভী জবাই করা হয়েছে। দেখেছি যে, আমি আমার হাত শক্তিশালী যারাহ্ (নিরাপদ পোশাক)-তে রেখেছি। আমি এ-ও দেখেছি, আমি বন্য ভেড়ার পিঠের উপর চড়ে বসেছি।"

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কী তা'বীর করেছেন এ স্বপ্নের? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, গাভী জবাই এর অর্থ আমার কিছু সাহাবী শহীদ হয়ে যাবেন। আমার তরবারীর অগ্রভাগ ভেঙ্গে যাবার অর্থ মনে হয় আমার নিকট আত্মীয়দের মাঝে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি শহীদ হবেন। অথবা সম্ভবতঃ আমিই এ যুদ্ধে কষ্টের সম্মুখীন হব। যারার মাঝে হাত রাখার অর্থ সম্ভবতঃ আমি মনে করি আমাদের মদীনার ভেতরে থেকে শত্রুর মোকাবেলা করা সংগত হবে। বন্য ভেড়ার উপর চড়ে বসার অর্থ শত্রু পক্ষের নেতার উপর আমরা প্রাধান্য লাভ করব। এবং সে মুসলমানদের হাতে মারা পড়বে। যদিও স্বপ্নে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের জন্য মদীনার ভেতরে থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করাই উচিত হবে। কিন্তু এ তা'বীর আঁ হযরত (সঃ)-এর নিজের তা'বীর ছিল, ইলহাম ছিল না; তাই আঁ হযরত (সঃ) অধিকাংশদের পরামর্শ মেনে নিয়েছিলেন এবং যুদ্ধের জন্য মদীনার বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তারপর আঁ হযরত (সঃ) প্রস্তুত হয়ে যখন বেরিয়ে আসলেন তখন মুসলমানদের যারা বাইরে যেতে উৎসাহী ছিল তারা (ভুল বুঝতে পেরে) লজ্জাবোধ করছিলেন তারা বললেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর পরামর্শই সঠিক ছিল যে, 'আমাদের মদীনায় থেকেই শত্রুর মোকাবেলা করা উচিত হবে।' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'আল্লাহ্‌র নবী যখন যারাহ্ (বর্ম) পরিধান করেন তখন তা আর খুলে ফেলেন না; এখন যাই হোক আমরা মদীনার বাইরেই যাব। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তাহলে আল্লাহ্‌র সাহায্য তোমরা পাবেই। এই বলে আঁ হযরত (সঃ) এক হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে মদীনার বাইরে চলে আসলেন এবং কিছু দূর গিয়ে রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে অবস্থান নিলেন। আঁ হযরত (সঃ)-এর পদ্ধতি এই ছিল যে, যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে বাহিনীকে আরাম করার এবং প্রস্তুতি নেবার সুযোগ দিতেন। সকালে ফজরের নামাযের জন্য যখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বাইরে আসলেন, জানতে পারলেন যে, কিছু সংখ্যক ইহুদী তাদের সহযোগী গোত্রের সাহায্যের জন্য এসেছে। আঁ হযরত (সঃ) ঈহুদীদের গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন। অতএব নির্দেশ দিলেন, 'ইহুদীদেরকে ফেরত চলে যেতে বল।' একথা শুনে মুনাফিকদের সরদার আব্দুল্লাহ্ বিন ওবাই বিন সলুল তার তিনশ' সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে ফেরত চলে গেল এ বলে যে, 'এতো যুদ্ধ নয়, ধ্বংসের মুখে চলে যাওয়া হচ্ছে।' কারণ নিজেদের সাহায্যকারীদের যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে। ফলতঃ মুসলমানরা সংখ্যায় এখন মাত্র ৭০০ রয়ে গেলেন। শত্রু সংখ্যার চারভাগের একভাগেরও কম। সাজ-সরঞ্জামের দিক থেকেও দুর্বল। শত্রুপক্ষে 'যারাহ্' পরিহিতদের সংখ্যা ছিল ৭০০, অথচ মুসলমানরা মাত্র ১০০, শত্রুপক্ষ মক্কার কাফিররা দু'শ অশ্বারোহী, কিন্তু মুসলমানদের মাত্র দু'টি ঘোড়া। অবশেষে তারা উহুদের ময়দানে পৌছে গেলেন। আঁ হযরত (সঃ) উহুদের ময়দানে পৌছেই সেখানে একটি গিরিপথের পাহারায় ৫০জনকে বসালেন। তাদের দল নেতাকে খুব গুরুত্বের সাথে বুঝিয়ে বলে দিলেন, এ গিরিপথের পাহারা অত্যন্ত জরুরী, আমরা মারা যাই অথবা জয়ী হই কোন অবস্থাতেই যেন এ স্থান ত্যাগ করা না হয়।

এরপর হুযূর (সঃ) বাদবাকী ৬৫০ জনকে নিয়ে শত্রুর মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হলেন। শত্রু সংখ্যা ছিল এর চেয়ে প্রায় পাঁচ গুণ বেশি। যুদ্ধ হল এবং আল্লাহ্‌র ফযল ও সাহায্যে অল্প সময়ের মাঝেই মুসলমানদের ৬৫০ জনের বিরুদ্ধে তাদের পাঁচগুণ বেশি সৈন্য, অভিজ্ঞ সৈন্য পরাজিত হয়ে দৌড়ে পালাতে থাকল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের কিতাবে উল্লেখ আছে। একটি রেওয়ায়াত এখানে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

হযরত বরাআ বিন আযেব বর্ণনা করেছেন। আঁ হযরত (সঃ) উহুদের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়েরের (রাঃ) নেতৃত্বে ৫০ জন সৈন্যের এক বাহিনীকে এক পাহাড়ের গিরিপথ পাহারায় নিয়োজিত করেছিলেন। আদেশ দিয়েছিলেন, "যদি তোমরা দেখ যে, আমাদেরকে কোন পাখী তুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের শরীরের মাংস খাচ্ছে, তবুও তোমরা এ গিরিপথ ছেড়ে দিবে না। আমি যেখানে তোমাদেরকে দাঁড় করিয়েছি এখান থেকে যাবে না। যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শত্রুদেরকে পরাজিত করেছি এবং আমরা তাদেরকে পদদলিত করে চলেছি, তবুও তোমরা এ স্থান ত্যাগ করবে না যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে ডেকে না পাঠাই। এরপর যুদ্ধ হয়ে গেছে। আমরা শত্রুপক্ষকে পরাজিত করেছি। আমরা দেখলাম, মক্কার কাফিরদের মহিলারা কাপড় - চোপড় নিয়ে ভয়ে ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। এ অবস্থার পর আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়েরের বাহিনী বলেছে, 'এখন তো কিল্লা ফতেহ্। আর কিসের অপেক্ষা? আমাদেরও চলে যাওয়া উচিত।' আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের বললেন, 'তোমরা আঁ হযরত (সঃ)-এর আদেশ ভুলে গেলে? হুযূর (সঃ) তো বলেছেন, যতক্ষণ হুযূর (সঃ) পয়গাম না দেবেন আমরা যেতে পারব না।' কিন্তু সেই দলের অনেকেই বলল, এখন বিজয় হয়ে গেছে, আমাদের সেখানে গিয়ে মালে গনীমত সংগ্রহ করা উচিত। এ বলে তারা সেই গিরিপথ অরক্ষিত রেখে নীচে নেমে আসল। যখন শত্রুপক্ষ লক্ষ্য করল যে, সেই গিরিপথ অরক্ষিত, তখন তারা পেছনে ফেরত এসে সেই গিরিপথ দিয়ে প্রবেশ করে মুসলমানদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করল। মুসলমানদের জয় পরাজয়ে পরিণত হ'ল। [এ ঘটনার কথাই কুরআন শরীফে বলা হয়েছে। রসূল (সঃ) তাদেরকে পেছন থেকে ডাকছিলেন।] এ অবস্থার মাঝে এক সময় এমনও এসেছিল যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে মাত্র ১২ জন রয়ে গিয়েছিলেন।

মোট ৭০ জন সাহাবী শহীদ হয়ে গেছেন। বদরের যুদ্ধে কাফিরদের ১৪০ জনের অবস্থা খারাপ হয়েছিল, ৭০ জন যুদ্ধ-বন্দী হয়েছিলো, ৭০ জন মারা গিয়েছিলো। এখানে আবূ সুফিয়ান তিনবার উচ্চস্বরে বলল, 'তোমাদের মাঝে মুহাম্মদ জীবিত আছে?' আঁ হযরত (সঃ) সাহাবায়ে কেরামকে জবাব দিতে বারণ করেন। তারপর সে বলল, 'তোমাদের মাঝে আবূ কুহাফার পুত্র আবূ বকর জীবিত আছে?' তারপর বলল, 'তোমাদের মাঝে ওমর বিন আল্ খাত্তাব আছে?' জবাব না পেয়ে সে পেছন ফিরে নিজ সৈন্যদের বলল, 'সবাই মারা গেছে।' হযরত উমর আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। অতি উচ্চ স্বরে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র শত্রু! আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যাদের নাম বলেছ, তারা সবাই জীবিত আছে এবং তোমাদের জন্য অপমান ছাড়া আর কিছুই নেই। একথা শুনে আবূ সুফিয়ান বলল, 'আমরা বদরের প্রতিশোধ নিয়েছি। যুদ্ধ তো পানি তোলার বালতিটির মত। কখনও এদিকে ঝুঁকে যায় কখনও অন্য দিকে। তোমাদের কিছু প্রিয়জনের লাশ বিকৃত করা হয়েছে তোমরা দেখতে পাবে। কিন্তু আমি

এমন করতে বলি নি। তবে এজন্য আমার অনুশোচনাও হচ্ছে না। এরপর ওলো হোবল, ওলো হোবল বলে উচ্চ স্বরে চিৎকার করতে থাকল। হোবল প্রতিমার জয়। এ চিৎকার শুনেই আঁ হযরত (সঃ) সাহাবায়ে কেরামকে জবাব দিতে বললেন। সাহাবা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কী বলে জবাব দেব? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, "বল, 'আল্লাহু আলা ওয়া আজাল'-আল্লাহ্‌ই সবার উপরে এবং তিনিই সবচেয়ে বড়। আবূ সুফিয়ান জবাবে বলল, 'আমাদের উয্‌যা আছে। তোমাদের কোন উয্‌যা নেই। আমাদের সাহায্যকারী উয্‌যা আছে। তোমাদের নেই।' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, জবাব দাও। সাহাবা জিজ্ঞেস করলেন কী জবাব দিব, হে আল্লাহ্‌র রসূল। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'জবাব দাও, 'আল্লাহ্ আমাদের মওলা (অভিভাবক, সাহায্যকারী) আছেন। তোমাদের এমন কোন মওলা নেই যে, আমাদের মওলার বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে' [সহী বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ]।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এ বিষয়ে যে বিবরণ লিখেছেন, তা আমি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। হুযূর (রাঃ) বলেছেন, 'মুসলমানরা এত বেশি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিলেন যে, কোন সৈন্যবাহিনী শত্রুদের আক্রমণের মুখে দাঁড়াবার মত ছিল না।' মুসলমান বিচ্ছিন্ন হয়ে একজন দু'জন হয়ে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছিলেন। এভাবে অনেকে শহীদ হয়ে গেলেন। বাকী অনেকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন, কী যে হয়ে গেল! এবং পিছে দৌড় দিলেন। কয়েকজন সাহাবী আঁ হযরত (সঃ)-এর পাশে একত্র হলেন। এরা বেশি হলে সংখ্যায় কুড়িজন হ'তে পারেন। আঁ হযরত (সঃ) যেখানে ছিলেন কাফির বাহিনী সেখানে প্রচন্ড আক্রমণ চালাতে থাকল। আঁ হযরত (সঃ)-এর হেফাযত করতে গিয়ে একের পর এক সাহাবী শহীদ হ'তে থাকেন। তরবারীর আক্রমণ ছাড়াও তীরন্দাজরা উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়তে থাকে। সে সময় কুরায়েশ বংশীয় হযরত তালহা (রাঃ), যিনি মুহাজিরীনদের একজন ছিলেন, দেখলেন, সমস্ত তীর আঁ হযরত (সঃ)-এর মুখমন্ডলকে লক্ষ্য করে চালানো হচ্ছে। তখন তিনি তাঁর এক হাত দিয়ে আঁ হযরত (সঃ)-এর মুখমন্ডলকে আড়াল করে রাখলেন। একের পর এক তীর এসে হযরত তালহার হাতের উপর পড়তে থাকল; যেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে আঁ হযরত (সঃ)-এর মুখমন্ডলের ওপর আঘাত করার কথা। সেগুলো তার হাতে আঘাত করতে থাকল। কিন্তু বিশ্বস্ত এবং জান -প্রাণ দিতে প্রস্তুত সাহাবী নিজের হাতকে সামান্য নাড়া-চাড়াও করতে দেন নি। এভাবে তীর তাঁর হাতে আঘাত করতে থাকে। এতবেশি আঘাত পেয়েছেন যে, এ হাত পরে দেখা গেল যে, সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেছে; মাত্র একটি হাত তাঁর কর্মক্ষম ছিল ... উহুদের পরে এক সময় কেউ হযরত তালহাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার হাতের উপর তীর পড়ত তখন তুমি কষ্ট পেতে না, তোমার উফ্ বের হয়ে যেত না? হযরত তালহা (রাঃ) জবাব দিয়েছিলেন, ব্যথাও হত, মুখ থেকে উফ্‌ও বের হতে চাইত; কিন্তু আমি উফ্ করতাম না যে, হাত নড়ে যাবে এবং কোন তীর আঁ হযরত (সঃ)-এর চেহারায় গিয়ে আঘাত করবে।

এ সামান্য সংখ্যক মুসলমান এত বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে কত সয়মই আর টিকে থাকতে পারত? এক সময় কাফির বাহিনীর একদল প্রচন্ড বেগে অগ্রসর হয়ে সাহাবীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেল। আঁ হযরত (সঃ) একাই পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন।

হঠাৎ একখানা ভারী পাথর এসে হুযূর (সঃ)-এর মাথার উপর পড়ে এবং মাথায় যে হ্যালমেট (মাথাকে নিরাপদ রাখে) ছিল তাতে আঘাত করে ফলে হ্যালমেটের একটি লোহার কাঁটা আঁ হযরত (সঃ)-এর মাথায় ঢুকে যায়। এবং আঁ হযরত (সঃ) সাহাবীদের লাশের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। এরপর আঁ হযরত (সঃ)-এর হেফাযতে যারা ছিলেন তারাও শহীদ হয়ে যান তাদের লাশ আঁ হযরত (সঃ)-এর উপরে গিয়ে পড়ে। কাফির বাহিনী যখন দেখে যে, আঁ হযরত (সঃ) মৃত দেহগুলোর নীচে চাপা পড়ে আছেন তখন তারা মনে করে, হুযূর (সঃ)-ও মারা গেছেন। এ দৃশ্য দেখার পর মক্কার কাফিররা নিশ্চিন্তে পেছনে সরে যায় যেন তারা নিজের সকলকে সুসংহত করতে পারে। আঁ হযরত (সঃ) আশপাশে যারা ছিলেন এবং মক্কার কাফিররা যাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল তাদের মাঝে হযরত উমর (রাঃ)-ও ছিলেন। তিনি দেখলেন, ময়দান খালি কেউ নেই। তখন তিনি ভাবলেন, আঁ হযরত (সঃ)-ও শহীদ হয়েছেন- এ উমর যিনি পরবর্তীতে একই সময়ে রোম সম্রাট কায়সার এবং ইরান সম্রাট কিসরার বিরুদ্ধে বড় সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন কখনও যার অন্তর ভয়ে কম্পমান হয় নি- সেই উমর এ সময় একটি পাথরের উপর বসে কাঁদতে লাগলেন। এক সাহাবীর নাম মালেক (রাঃ)। যখন যুদ্ধের প্রথম পর্বে মুসলমানদের বিজয় হয়ে গিয়েছিল তখন তিনি মাঠ থেকে সরে একদিকে গিয়েছিলেন। তিনি অভুক্ত ছিলেন। গত রাতে তার খাবার খাওয়া হয় নি। এ মালেক (রাঃ) সেসময় কয়েকটি খেজুর নিয়ে পেছনে সরে গিয়ে খেয়ে ক্ষুধা মিটাতে চেয়েছিলেন। তিনি বিজয়ের আনন্দে পদাচারণা করছিলেন; এবং হযরত উমরের কাছে চলে এসে দেখেন উমর কাঁদছেন। হযরত উমরকে কাঁদতে দেখে হযরত মালেক খুব আশ্চর্যান্বিত হলেন, জিজ্ঞেস করলেন, উমর! আপনার কী হয়েছে। ইসলামের বিজয় আর আপনি কাঁদছেন! এটা কাঁদার সময় নয়, আনন্দের সময়? হযরত উমর উত্তর দিলেন, মালেক! তুমি হয়ত জান না, বিজয়ের পরে হয়ত তুমি সরে এসেছ, তুমি জান না যে, শত্রুরা পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে এসে মুসলমান বাহিনীর উপর হঠাৎ প্রচন্ড আক্রমণ করেছে। মুসলমানরা যেহেতু বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল তাই তারা শত্রুর মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আঁ হযরত (সঃ)-এর কোন কোন সাহাবী মোকাবেলা করতে করতে শহীদ হয়েছেন। মালেক (রাঃ) বললেন, আপনার কথা যদি সত্য হয় তাহলে এখানে বসে আপনি কাঁদছেন কেন? আমাদের প্রাণ-প্রিয় হুযূর (সঃ) যে জগতে চলে গেছেন আমাদেরও তো সেখানেই যাওয়া উচিত। একথা বলেই নিজের হাতের খেজুর যা হযরত মালেক মুখে দিতে চেয়েছিলেন মুখে না দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মাটিতে, বললেন, হে খেজুর! জান্নাতের ও মালেকের মাঝখানে তুই ছাড়া আর কিসের বাধা? এই বলে তরবারী হাতে তিনি শত্রু বাহিনীর মাঝে প্রবেশ করলেন। তিন হাজার সৈন্য বাহিনীর মাঝে একজন কি করতে পারে? কিন্তু তবুও এক খোদার উপর বিশ্বাসী একজন মু'মিনও তো অনেকের তুলনায় ওজনে ভারী হয়। হযরত মালেক প্রাণ-পণ লড়াই করলেন- শত্রুরা হতভম্ব হয়ে গেল। অবশেষে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। পড়ে পড়েও শত্রুদের উপর আক্রমণ করতে থাকলেন। ফলে শত্রুরা নির্মমভাবে আক্রমণ চালালো তাঁর ওপর। যুদ্ধ শেষে হযরত মালেকের (রাঃ) লাশের সত্তরটি টুকরা পাওয়া গিয়েছিল। তার লাশ চিহ্নিত করা যাচ্ছিল না। শেষে তাঁর বোন তাঁর হাতের আঙ্গুল দেখে চিনতে পেরেছিলেন যে, এ লাশ তাঁর ভাই মালেকের (রাঃ)।

আঁ হযরত (সঃ)-এর আশে-পাশে যারা ছিলেন, কাফিরদের প্রচন্ড ধাক্কায় দূরে সরে পড়েছিলেন। তারা আস্তে আস্তে আবার আঁ হযরত (সঃ)-এর আশে পাশে জমা হলেন। আঁ হযরত (সঃ)-এর মোবারক দেহকে তুলে আনলেন। হযরত ওবায়দুল্লাহ্ বিন আল্ জাররাহ্ (রাঃ) দাঁত দিয়ে জোরে টেনে হুযূর (রাঃ)-এর মাথায় প্রবিষ্ট থাকা কাঁটা বের করে আনলেন। তার দু'টি দাঁত ভেঙ্গে গেল। অল্প পরে আঁ হযরত (সঃ)-এর জ্ঞান ফিরে আসল। সাহাবারা চারিদিকে লোক পাঠালেন, দৌড় গিয়ে সবাইকে খবর দিয়ে ডেকে আন। বিভিন্ন দিকে ছিটকে পড়া মুসলমানরা আবার একত্র হতে লাগলেন। আঁ হযরত (সঃ) সবাইকে নিয়ে পাহাড়ের এক কোলে আসলেন। ... শত্রুরা পেছনে সরে গিয়েছিল। আঁ হযরত (সঃ) সাহাবায়ে কেরামকে ময়দানে গিয়ে শহীদ বা আহতদের খোঁজ-খবর করতে বললেন। একজন সাহাবী খোঁজ করতে করতে একজন আহত আনসারী সাহাবীর পাশে পৌছলেন। দেখুন, এমন অবস্থায় সাহাবী কী নমুনা দেখাচ্ছেন! সেই আহত আনসারীর অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। প্রায় শেষ নিঃশ্বাস নিতে যাচ্ছিলেন। এ সাহাবী তাকে সালাম বললেন, আনসারী কম্পমান হাত করমর্দনের জন্য তুলতে চাচ্ছিলেন। ইনি তাঁর হাত ধরে ফেললেন, আনসারী সাহাবী বললেন, আমি অপেক্ষা করছিলাম, কেউ যদি আসে। তিনি বললেন, আপনার অবস্থা তো ভাল নয়। আপনি যা বলতে চান বলুন। আপনি যদি আপনার আত্মীয়-স্বজনকে কোন পয়গাম দিতে চান দিয়ে দিন। মৃত্যুপথ যাত্রী সাহাবী বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার পক্ষ থেকে আমার আত্মীয়দেরকে সালাম বলবেন। আর বলবেন, 'আমি মারা যাচ্ছি। কিন্তু পেছনে আল্লাহ্র পবিত্র আমানত হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে রেখে যাচ্ছি। হে আমার ভাইয়েরা, আত্মীয়-স্বজন! আঁ হযরত (সঃ) আল্লাহ্র সত্য রসূল। আমি আশা করি তোমরা তাঁর (সঃ) নিরাপত্তা বিধান করতে গিয়ে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করবে না এবং আমার এ ওসীয়্যতকে স্মরণ রাখবে' (মুয়াত্তা ইমাম মালেক ও যুরকানী)

আঁ হযরত (সঃ) শহীদদেরকে দাফন করে মদীনায় ফিরছিলেন তখন মদীনার মহিলা ও শিশুরা আঁ হযরত (সঃ)-কে সুস্বাগতম জানাতে রাস্তায় নেমে এসেছিল। আঁ হযরত (সঃ)-এর উটনীর লাগাম মদীনার রইস (নেতা) হযরত সা'দ বিন মাআয (রাঃ)-এর হাতে ধরা ছিল। হযরত সা'দ সগৌরবে আগে আগে দৌড়াচ্ছিলেন। সম্ভবত পৃথিবীর মানুষকে বলতে চাচ্ছিলেন, 'দেখেছ! আমরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে সুস্থ অবস্থায় আমাদের গৃহে নিয়ে আসছি।' শহরের উপকণ্ঠে হযরত সা'দ নিজের বৃদ্ধা মাকে দেখতে পেলেন যার দৃষ্টি-শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, যার এক ছেলে ওমর বিন মাআয এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। হযরত সা'দ আঁ হযরত (সঃ)-কে জানালেন, সামনে আমার মা আসছেন। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'আল্লাহ্র বরকতসহ সে আসুক।" বৃদ্ধা এদিক ওদিক দেখছিলেন যে, আঁ হযরত (সঃ)-কে দেখবেন। অবশেষে আঁ হযরত (সঃ)-কে চিনতে পারলেন এবং খুব খুশী হলেন।

আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'মা, তোমার ছেলে উমর বিন মা'আযের মৃত্যুতে আমি তোমার প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।' এ কথা শুনে সেই পুণ্যবতী মা বললেন, হুযূর! আমি আপনাকে সুস্থ অবস্থায় দেখেছি, এতেই আমি আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়েছি।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) লিখেছেন, 'মোটকথা আঁ হযরত (সঃ) সুস্থ অবস্থায় মদীনায় পৌছে গেলেন। যদিও উহুদের যুদ্ধে অনেক মুসলমান শহীদ হয়েছেন, অনেকে আহত হয়েছেন। এরপরও একথা বলা যায় না যে, এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে। আমি উপরে যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করেছি, সে সব ঘটনাকে সামনে রেখে বলতে হয় যে, অনেক বড় বিজয় হয়েছিল। এমন বিজয় যে, কিয়ামতকাল পর্যন্ত মুসলমানরা এসব ঘটনাকে স্মরণ করে নিজেদের ঈমান বাড়াতে পারবেন এবং বাড়াতে থাকবেন। (তফসীরুল কুরআনের ভূমিকা ঃ পৃঃ ১৫১-১৫৭)।

এ সম্পর্কে হাদীস আছে। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)-এর শেষ বাক্যগুলো হাদীসে উল্লেখ আছে, তিনি যুদ্ধে ইসলামের পতাকা বহন করছিলেন। যখন যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বে মুসলমানদের অবস্থা বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ল তখন তিনি শত্রু বাহিনীর বেড়াজালে আটকে পড়লেন। মুশরিক অশ্বারোহী ইবনে কমিয়া তাঁর উপর তরবারির আঘাত করলে তাঁর হাত কেটে গেল। তিনি সাথে সাথে ইসলামী পতাকাকে বাম হাতে ধরলেন। তখন তার মুখে আয়াত, **ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসূল কাদ খালাত মিন কাবলিহির রসূল** উচ্চারিত হচ্ছিল। ইবনে কমিয়া দ্বিতীয়বার তরবারির আঘাত করলে তাঁর বাম হাতও কেটে পড়ে গেল। তখন তিনি উভয় বাহু দিয়ে পতাকাকে বুকের সাথে লাগিয়ে ধরলেন। এবার ইবনে কমিয়া তরবারি ফেলে রেখে নেজা (বা বল্লম) তাঁর বুকে ঢুকিয়ে দিলে নেজার অগ্রভাগ তাঁর বুকেই রয়ে গেল। এভাবে হযরত মুসাব বিন উমায়ের (রাঃ) ইসলামের এক নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক কুরআনী আয়াত পড়তে পড়তে প্রিয় প্রভুর দরবারে হাজির হয়ে গেলেন (তবাকাতে কাবীর, ইবনে সা'দ, ৩য় খন্ড, যিক্রে মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)]।

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমার চাচা আনাস বিন নযর (রাঃ) বদরের যুদ্ধে শামিল হতে পারেন নি। তিনি প্রায়ই এজন্যে দুঃখ প্রকাশ করতেন। একবার আঁ হযরত (সঃ)-কে বলছিলেন, 'হে রসূলুল্লাহ্! আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রথম যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, আমি তাতে শামিল হতে পারি নি। আল্লাহ্ যদি আবার আগামীতে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে সুযোগ দেন তা হলে আমি দেখাব যে, আমি কী করি! অন্যরা তার একথা শুনে আশ্চর্য হতেন।

এরপর উহুদের যুদ্ধ হলো, তখন এ যুদ্ধে এক সময় এমন এসে গেল যখন মুসলমানরা বিশৃঙ্খলায় পড়ে গেলেন, তাদের প্রস্তুত করা সারিবদ্ধতা ভেঙ্গে পড়ল। তখন এ আনাস (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ্! আমাদের লোকদের এ অবস্থার জন্য তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এবং শত্রুদের বা জালেম মুশরিকদের ব্যবহারে আমি খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। [অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তুমি ক্ষমা করে দিও] এরপর হযরত আনাস (রাঃ) সামনে অগ্রসর হলেন। সামনে সা'দবিন মা'আয-এর সাথে দেখা হ'ল। আনাস বিন নযর (রাঃ) সা'দ বিন মা'আযকে বললেন, 'দেখ, জান্নাত কত নিকটে।' কা'বা গৃহের প্রভুর কসম! উহুদের পাহাড় থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। হযরত সা'দ বিন মাআয আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে এ ঘটনা শোনালেন আর বললেন, 'আনাস বিন নযর যা বললেন তা করে দেখালেন। আর আমি তা করতে পারলাম না!'

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর ঘটনার বর্ণনাকারী এরপর বললেন, 'আমরা আমাদের চাচা [আনাস বিন নযর (রাঃ)] -এর লাশ এমন অবস্থায় পেয়েছি, যার উপর ৮০ এর বেশি তরবারি, নেজা বা তীরের আঘাতের চিহ্ন ছিল। মুশরিকরা তার চেহারা বিকৃত করে দিয়েছিল। তাঁর বোন ছাড়া তাঁর লাশ আর কেউ চিনতে পারে নি। আঙ্গুলের চিহ্ন দেখে তাঁর বোন

ভাইকে চিহ্নিত করেছিলেন। আমরা মনে করি যে, এ আয়াত এমন সাহাবায়ে কেরামের বা এমন ঈমানদারদের পক্ষেই নাযেল হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, 'মু'মিনদের মাঝে এমন আছেন যারা আল্লাহ্‌র সাথে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা তারা পূর্ণ করে দেখিয়েছেন এবং তারা তাদের প্রতিজ্ঞাকে সত্য করে দেখিয়েছেন' (বুখারী; কিতাবুল জিহাদ)।

আঁ হযরত (সঃ) সবাইকে নিয়ে মদীনায় ফেরত আসতেই খবর আসল যে, শত্রুরা ফেরত যেতে গিয়ে পুনরায় একত্র হয়ে মদীনার উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। আঁ হযরত (সঃ) মাত্র উহুদের যুদ্ধ শেষে শনিবার সন্ধ্যায় মদীনায় এসেছেন এবং রাত কাটিয়েছেন। সারা রাত মুসলমানেরা ক্ষতস্থানগুলোতে ঔষধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করেছেন অর্থাৎ মুসলমানরা প্রায় সবাই আহত হয়েছিলেন। আঁ হযরত (সঃ) ফজরের নামাযের পরে হযরত বেলালকে আদেশ দিলেন, সবাই ডাক। বলে দাও যে, শত্রুদের পেছনে পেছনে আমাদেরকে যেতে হবে; আঁ হযরত (সঃ)-এর নির্দেশ। শত্রু পক্ষকে আল্লাহ্‌র উপরে এখানে এসে আক্রমণ করতে দেয়া হবে না। আমরা তাদের পেছনে ধাওয়া করবো। আমাদের সাথে কেবল তারাই যাবে যারা উহুদে আমাদের সাথে সাথে ছিলেন। আঁ হযরত (সঃ) নিজের পতাকা আনালেন এবং বাঁধা অবস্থায় হযরত আলীকে (রাঃ) দিলেন। তাঁরা সবাই আহত ক্ষত -বিক্ষত অবস্থা নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে যাত্রা করলেন। মদীনার বাইরে দশ মাইল পর্যন্ত গিয়ে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন এবং বিরাট বড় আগুন জ্বালালেন। দূর-দূরান্ত থেকে আগুন দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে, বিরাট বড় কোন সেনাবাহিনী সেখানে উপস্থিত আছে। আল্লাহ্‌তাআলা মুশরিকদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করলেন। ফলে তারা দ্রুত মক্কায় ফেরত চলে গেল। আঁ হযরত (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম সেখানে সোম, মঙ্গল, বুধবার পর্যন্ত অবস্থান করলেন। তারপর মদীনায় ফেরত চলে আসলেন [তারিখ তাবারী; ২য় খন্ড, পৃঃ ৭৫]

আমি আপনাদেরকে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ পড়ে শোনালাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে বলেছেন। হুযূর (রাঃ) আলোচ্য আয়াত উল্লেখ করে বলেছেন, 'আঁ হযরত (সঃ) মু'মিনদেরকে নির্দিষ্ট স্থানে বসাচ্ছিলেন যেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে। উহুদের যুদ্ধের প্রসঙ্গে উল্লিখিত এ আয়াত থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, শত্রুর মোকাবেলা তোমরা করবে, মুনাজারা মুবাহাসা (তর্ক যুদ্ধ) যা-ই কর কিন্তু যুগ-ইমামের মর্জি মত যেন হয়। কারণ সেই বিন্যাস যার শেষ ফল বিজয় ও সাফল্য তা কেবল আল্লাহ্‌র সেই বান্দাই জানেন (যিনি যুগ ইমাম)' (হাকায়েকে ফুরকান; ১ম খন্ড; পৃঃ ৫২৫-৫২৬)]।

কোন কোন পত্র পড়ে আমার চিন্তা হ'ল যা আমি এখানে বললাম। এক ব্যক্তি আমাকে লিখেছেন, আমাদের শত্রুরা সব সময় আমাদের বিরুদ্ধে অনলবর্ষী বক্তব্য দিয়ে চলেছে। জামাতের বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট বক্তব্য দিয়ে চলেছে।' তারপর তবলীগের উল্লেখ করেছে, 'আমি যাদের তবলীগ করছি তাদের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে দেয়া হচ্ছে। আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে তাদেরকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, আহমদীরা যদি সত্যের উপর হয়ে থাকে তাহলে তাদের সাথে যেন মুবাহালা করা হয়।' পত্র লেখক লিখেছেন, 'আমার মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা উচিত। আমাকে অনুমতি দেয়া হোক।' এ পত্র আমার জন্য চিন্তার কারণ নয়। কিন্তু বিভিন্ন স্থান থেকে যদি এ ধরনের পত্র আসা আরম্ভ হয় এটি চিন্তার বিষয়। অতএব এ ব্যাপারে স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত খলীফা আওওয়াল (রাঃ) যেমন লিখেছেন, **'প্রত্যেক বিষয়ে ইমামের ইচ্ছার পেছনে থাক। কারো এ অধিকার নেই যে ইমামের সামনে দিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। অথবা কাউকে মোবাহালার চ্যালেঞ্জ দিবে। কোন ব্যক্তির এ অধিকার নেই**। এর জন্যও কিন্তু নিয়ম-কানুন আছে। আঁ হযরত (সঃ) ইহুদী বা খৃষ্টানদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। যতক্ষণ খোদা তাঁকে বলেন নি বা পদ্ধতি বলে দেন নি তা নিজ ইচ্ছায় দেন নি। হুযূর (সঃ) সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে হেফাযত প্রার্থনা করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-ও তেমনই যখন শত্রুর আক্রমণ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তখন আল্লাহ্‌র আদেশে বিভিন্ন ব্যক্তিকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) যে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন তা আল্লাহ্‌র আদেশেই দিয়েছিলেন। এটা তো এমন কথা নয় যে, যে কেউ উঠে দাঁড়াবে এবং এ ধরনের চিন্তা করবে। মুবাহালা বা মুনাযারার ক্ষেত্রে এমন কোন শর্ত যুক্ত করা উচিত নয় যে, যদ্বারা এমন ধারণা হতে পারে যে, আপনি আপনার শর্তের সাথে জামাতের এবং আহমদীয়তের সত্যতাকে সংযুক্ত করে দিয়েছেন- এমন কোন শর্ত মেনে নেয়ার অনুমতিও নেই। অথবা আপনার দোয়ার সাথে শর্ত যুক্ত করবেন। আহমদীয়ত অবশ্যই সত্য এবং আল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব হয়েছে। এবং আঁ হযরত (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই হয়েছে। আহমদী জামাতের একশ' বছরের ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদেরকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মুবাহালার সামনে এসেছে আমরা তাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে দেখেছি। খোদা স্বয়ং আমাদের হয়ে প্রতিশোধ নিয়েছেন এবং প্রতিশোধ নিয়ে চলেছেন। সুতরাং আপনার চিন্তার কী আছে? ভয়ের কী আছে? অতএব আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের জন্য ইমামকে ঢাল বানিয়েছেন। আপনারা তার পেছনে থাকবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে যে সমস্ত দলিল-প্রমাণ তবলীগের জন্য দিয়ে গেছেন সেগুলোর মাধ্যমে তবলীগ করতে থাকুন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, 'যার ফিতরত নেক; প্রকৃতির মাঝে পুণ্য আছে, সে অবশেষে আসবেই।'

সবচেয়ে বেশি দোয়া করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে তাকে সাহায্য করবেন। আমাদের খোদা সদা জাগ্রত জীবন্ত খোদা। আজও তিনি আমাদেরকে তাঁর নিজের তাজাল্লী বা বিকাশ দেখাচ্ছেন। এবং ইনশাআল্লাহ্ দেখিয়ে যাবেন। আপনি নিশ্চিত থাকুন। হ্যাঁ, একটি শর্ত এই যে, খাঁটি অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকে পড়ুন এবং সাহায্য প্রার্থনা করুন। তিনি তো আছেন, আমাদের দোয়া শুনছেন। তাঁর তৌহীদকে পৃথিবীর বুকে কায়েম করার চেষ্টা করুন। যে বিরোধী মুবাহালার আগ্রহ রাখে সে তার আকাঙ্ক্ষা পুরণ করুক। যত ইচ্ছা খোদাকে ডাকতে থাকুক, সে তার নাক ঘর্ষণ করতে থাকুক। কপাল ঠুকতে থাকুক। যারা জামাতের বিরুদ্ধে চেষ্টা চালাবে তাদের দোয়া কখনই কবুল হবে না। আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের বিজয় অবশ্যই হবে, ইনশাআল্লাহ্। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বাক্যটি সর্বদা স্মরণ রাখবেন, "আমি মা'মুর (প্রত্যাদিষ্ট) হয়েছি এবং আমাকে বিজয়ের শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে।"

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ৫-১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ইং)।

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)

(১৪তম কিস্তি)

অতএব সুনিশ্চিৎ জানা আবশ্যক যে, তা এক কাশ্ফ বা দিব্যদর্শন জাতীয় বিষয় ছিল যা ক্রুশীয় ঘটনার পর কোন কোন পবিত্রচেতা ব্যক্তি স্বপ্নের ন্যায় অবলোকন করেছিলেন যেন পবিত্র মৃত ব্যক্তিরা জীবিত হয়ে নগরে চলে এসেছেন এবং মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন। স্বপ্নের যেমন নিজস্ব ব্যাখ্যা বা তা'বীর রয়েছে, যেমন খোদার পবিত্র গ্রন্থাবলীতেও লিপিবদ্ধ আছে- উদাহরণস্বরূপ, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তেমনি এ স্বপ্নটিরও নিজস্ব এক ব্যাখ্যা ছিল। আর সে ব্যাখ্যাটি ছিল হযরত মসীহ্ (আঃ) ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে মারা যান নি। বরং খোদা তাঁকে ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন। যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, এ ব্যাখ্যাটি আমি কোথা থেকে জানতে পারলাম তাহলে এর উত্তর হলো, স্বপ্নের ব্যাখ্যাবিদ শীর্ষ স্থানীয় ইমামগণ তদ্রূপই লিখেছেন এবং তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। অতএব আমি এখানে প্রাচীন কালের স্বপ্ন সম্বন্ধীয় সর্বস্বীকৃত একজন নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাবিদ (ইমাম ইবনে সীরীন) অর্থাৎ 'তা'তীরুল আনাম' নামক প্রসিদ্ধ কিতাবের প্রণেতার দেয়া ব্যাখ্যা মূল ভাষ্যসহ নিম্নে উদ্ধৃত করছি ঃ

"মান রায়া আন্নাল মওতা ওয়াসাবু মিন কুবূরিমি ওয়া রাজাউ দুওয়ারাহুম ফাইন্নাহু ওয়াত্লাকু মান-ফিস্ সিজনি"

অর্থাৎ যদি কেউ স্বপ্ন দেখে বা কাশ্ফের ধারায় দর্শন করে যে, মৃতরা কবর থেকে বেরিয়ে এসেছে ও তাদের বাড়ী-ঘরে ফিরেছে, তাহলে এর তা'বীর বা ব্যাখ্যা হচ্ছে, এক বন্দী তার বন্দীশালা থেকে রেহাই পাবে এবং জালেমদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে (কুতবুয্যামান শায়খ আব্দুল গনী নাবলুসী প্রণীত কিতাব 'তাতীরুল আনাম ফি তাবীরিল মানাম' পৃষ্ঠা ২৮৯)। বর্ণনার ধারায় প্রতীয়মান হয়, সে কোন সাধারণ বন্দী নয় বরং সে এক বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন বন্দী। এখন লক্ষ্য করুন, এ ব্যাখ্যাটি কত যুক্তিসঙ্গতভাবে হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর ওপর প্রযোজ্য হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে বুঝা যায়, এ ইঙ্গিতকেই স্পষ্ট প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে (স্বপ্নে) পরলোকগত পুণ্যাত্মাদেরকে জীবিত হয়ে নগরে প্রবেশ করতে দেখা যায়, যেন (এতে) সূক্ষ্মদর্শী লোকেরা বুঝে ও শুনে নেয় যে, হযরত মসীহ্কে ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

এমনি ধারায় ইঞ্জিলগুলোতে আরও অনেক জায়গায় স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মসীহ্ (আঃ) ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে মারা যান নি, বরং নিষ্কৃতি লাভের পর অন্য কোন দেশে চলে যান। কিন্তু যতটুকু আমি বর্ণনা করেছি তা ন্যায়বিচার ও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের বুঝার জন্যে যথেষ্ট।

হয়ত কারও কারও মনে এ আপত্তি বা সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে, ইঞ্জিলগুলোতে তো বার বার এ কথার উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মসীহ্ ক্রুশে বিদ্ধাবস্থায় মারা যান, তারপর পুনর্জীবিত হয়ে আকাশে চলে যান। এ ধরনের আপত্তির জবাব পূর্বে আমি সংক্ষেপে দিয়ে এসেছি। এখন আবারও এটুকু বর্ণনা করে দেয়া সমীচীন মনে করি যে, হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশীয় ঘটনার পর যখন তাঁর শিষ্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, গালীল পর্যন্ত সফর করেন, রুটি ও কাবাব খান, তাঁর দেহের ক্ষত স্থানগুলো দেখান, ইম্মাউস নামক স্থানে শিষ্যদের সাথে একত্রে রাত যাপন করেন ও পিলাতের রাজ্য থেকে সংগোপনে পলায়ন করেন এবং নবীদের সুন্নত (চিরায়ত নিয়ম) অনুযায়ী সে দেশ থেকে হিজরত করেন ও ভয়ে ভয়ে যাত্রা করেন, তখন এ যাবতীয় ঘটনা-ই প্রমাণ করে ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, তিনি ক্রুশে মারা যান নি, বরং নশ্বর দেহের যাবতীয় গুণ ও লক্ষণ স্বাভাবিকভাবে তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল এবং অভিনব কোন পরিবর্তন ঘটে নি। আর আকাশে উঠে যাওয়ার কোন চাক্ষষ সাক্ষ্য ইঞ্জিল থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না।*

এরূপ সাক্ষ্য থাকলেও তা আস্থা যোগ্য হতো না। কেননা ইঞ্জীল রচয়িতাদের এ স্বভাবই প্রতীয়মান হয় যে, তারা কথাকে অতিরঞ্জিত করে গল্প বানিয়ে ফেলেন এবং সামান্য একটি বিষয়কে এতে টীকা-টিপ্পনীর রঙ চড়িয়ে পাহাড় বানিয়ে দেন। যেমন, কোন ইঞ্জিল রচয়িতার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'মসীহ্ খোদার পুত্র।' তখন ইঞ্জিলের আরেক রচয়িতা তাঁকে পূর্ণাঙ্গ খোদা বানিয়ে দিতে ধ্যান মগ্ন হন। আর তৃতীয়জন তাঁকে সমস্ত আকাশ ও জগতের ক্ষমতা দিয়ে দেন এবং চতুর্থজন প্রকাশ্যভাবে বলে ওঠেন, 'তিনিই সবকিছু; তিনি ব্যতীত কোন খোদা নেই।' মোট কথা, এভাবে অতিশয়োক্তি তাদেরকে বহু দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। লক্ষ্য করুন, যে স্বপ্নটিতে মৃতদেরকে দেখা গিয়েছিল তারা যেন কবর থেকে উঠে এসে নগরে প্রবেশ করেছে, সে ক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থের ওপর জোর দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই মৃতরা কবর থেকে বেরিয়ে সত্যি সত্যি জেরুযালেমে ঢুকে নগরবাসীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিল বলে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এখন ভেবে দেখুন, (তাদের দৃষ্টান্ত এমনই যেমন) একটি পালক থেকে কাক বানানো হয়। এরপর তা কেবল একটি থাকে না, বরং লক্ষ লক্ষ কাক বানিয়ে উড়ানো হয়। কাজেই যেখানে অতি - শয়োক্তির এহেন অবস্থা, সেখানে প্রকৃত সত্যের সন্ধান কী করে লাভ করা যায়? লক্ষণীয় বিষয় হলো, খোদার কিতাব বলে অভিহিত এ ইঞ্জিলগুলোতে এমন সব অতিশয়োক্তিও করা হয়েছে, যেমন এতে লেখা আছে, 'মসীহ্ যে সকল কর্মকান্ড সম্পাদন করেছেন সেসব গ্রন্থাগারে লিপিবদ্ধ করা হলে তা পৃথিবীতে সংকুলান হতো না' (যোহন ২১ঃ২৫)।' এতো অতিশয়োক্তি কি কোন সততা ও সরলতার রীতি? এ কি সত্য ও সঙ্গত নয় যে, মসীহ্র কর্মকান্ড এমনই সীমাহীন হয়ে থাকলে তা কী করে তিন বছর সময়-সীমার আওতায় এসে গেল? ইঞ্জিলগুলাতে পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীর কিছু ভুল উদ্ধৃতিও দেয়া হয়েছে। হযরত মসীহ্র বংশ তালিকাও তারা শুদ্ধভাবে লিখতে পারেন নি। ইঞ্জিলগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়, এসব (ইঞ্জিল রচয়িতা) বুযুর্গ কিছু মোটা বুদ্ধির লোক ছিলেন; এমন কি তাদের কেউ কেউ হযরত মসীহ্কে ভূত বলে ভেবে বসেছিলেন। এ ইঞ্জিলগুলোর প্রামাণিকতা অক্ষুণ্ন থাকার বিরুদ্ধেও পূর্বকাল থেকে অভিযোগ চলে এসেছে। বিশেষতঃ যেখানে ইঞ্জিলের নামে আরও অনেকগুলো গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, সেখানে ওগুলোতে লিপিবদ্ধ বিষয়বস্তুর সবটাই কেন বাতিল করা হবে আর কেনই বা এ (প্রচলিত) ইঞ্জিলগুলোর লিখা সাকল্য বিষয়কে মেনে নিতে হবে? অথচ এর পক্ষে আমাদের কাছে অকাট্য কোন যুক্তি প্রমাণ নেই। অন্য ইঞ্জিলগুলোতে কখনও এতো ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে আমরা ধারণা করতে পারি না, যেমন এ চার ইঞ্জিলে অদ্ভুত এমন সব বিষয় বিদ্যমান যে, এক দিকে তো এ পুস্তকগুলোতে মসীহ্র পাক-পবিত্র ও নির্দোষ চাল-চলন স্বীকার করা হয়, কিন্তু অন্য দিকে আবার তাঁর প্রতি এমন অপবাদ আরোপ করা হয়েছে যা কখনও কোন সত্যপরায়ণ

** টীকা ঃ কেউ বর্ণনা করে না যে, সে একথার সাক্ষী এবং সে নিজ চোখে তাঁকে আকাশে উঠে যেতে দেখেছে।*

মহাপুরুষের ক্ষেত্রে বিবেচিত হতে পারে না। যেমন, ইস্রাঈলী নবীরা সাধারণতঃ তওরাতের শিক্ষা অনুযায়ী লোকের বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এককালীন শত শত স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আপনারা নিশ্চয় কখনও শুনেন নি, কখনও কোন নবী উশৃঙ্খলতার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, কোন অশুচি দুশ্চরিত্রা নারীকে এবং শহরের কুখ্যাত পতিতাকে তিনি নিজ দেহ স্পর্শের ও তাঁর মাথায় হারাম উপায়ে উপার্জিত তেল মালিশের এবং তাঁর পায়ে তার কেশ মর্দনের প্রশ্রয় দিয়েছেন আর এসব কিছু একজন খারাপ ধ্যান - ধারণার যুবতী নারীকে করতে দিয়েছেন এবং তাকে নিষেধ করেন নি। এ ক্ষেত্রে কেবল (হযরত মসীহ্‌র পবিত্রতার প্রতি) সুধারণার কল্যাণে মানুষ সেসব থেকে রক্ষা পেতে পারে যা এহেন দৃশ্যাবলী দেখে স্বভাবতঃ সৃষ্টি হয়। তবুও এ দৃষ্টান্ত অন্যদের জন্য ভাল (কল্যাণজনক) নয়। মোট কথা, এ ইঞ্জিলগুলোতে বহুল পরিমাণে এমন বিষয় রয়েছে যাতে প্রতীয়মান হয় যে, এ ইঞ্জিলগুলো নিজ মূল ভাষ্য রক্ষা করতে পারে নি অথবা এগুলোর রচয়িতা বরং অন্য কতিপয় লোক, হাওয়ারী তথা শিষ্য নয়। যেমন, মথি লিখিত ইঞ্জিলে (৯ঃ৯) এ বাক্যটি রয়েছে ঃ 'আর সে স্থান হইতে যাইতে যাইতে যীশু দেখিলেন, মথি নামক এক ব্যক্তি কর গ্রহণ স্থানে বসিয়া আছে।' অতএব এর লেখক হিসাবে মথিকে নির্ধারণ করা কি সঠিক ও সমীচীন হতে পারে? এতে কি প্রতীয়মান হয় না, এ ইঞ্জিলটির লেখক মথির মৃত্যুর পরে অন্য কোন ব্যক্তি ছিল? তেমনি, মথি লিখিত ইঞ্জিলেই ২৮ অধ্যায়ের ১২ ও ১৩ শ্লোকে লিখা আছে ঃ 'তখন তাহারা (অর্থাৎ ইহুদীরা) প্রবীণবর্গের সহিত একত্র হইয়া ও মন্ত্রণা করিয়া সেই সেনাগণকে অনেক টাকা দিল, কহিল, তোমরা বলিও যে, তাহার (অর্থাৎ মসীহ্‌র) শিষ্যগণ রাত্রিকালে আসিয়া, যখন আমরা নিদ্রাগত ছিলাম, তখন তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।' কত অন্তঃসারশূন্য ও অযৌক্তিক কথাবার্তা! এসব কথার যদি অর্থ হয়, যীশু (মসীহ্ নিজ) মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবার বিষয়টি গোপন করতে চেয়েছিলেন এবং তারা (ইহুদীরা) প্রহরারত সৈন্যদের এ উদ্দেশ্যে ঘুষ দিয়েছিল যাতে সে মহান মু'জিযাটি তাদের জাতির মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করতে না পারে, তাহলে যীশু কেন তা গোপন রাখলেন? অথচ তাঁর কর্তব্য ছিল তাঁর সে মু'জিযাকে ইহুদীদের মাঝে প্রকাশ ও প্রচার করা। তা না করে বরং অন্যদেরকেও তিনি জীবিত আছেন বলে প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। যদি বলেন, তাঁর ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল, তাহলে আমি বলবো, একবার যখন তাঁর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তাআলার তকদীর তথা শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটে গেলো এবং তিনি মারা গেলেও ঐশ্বরিক দেহ নিয়ে যখন জীবিত হয়ে উঠলেন, তখন আবার ইহুদীদের পক্ষ থেকে তাঁর কিসের ভয় ছিল? কেননা তখন ইহুদীরা কোনভাবেই তাঁকে কাবু করতে সক্ষম হতো না। কেননা তখন তো তিনি নশ্বর জীবনের উর্ধ্বে উঠে গিয়ে ছিলেন। আফ্‌সোস! এক দিকে তাঁর ঐশ্বরিক দেহ নিয়ে পুনর্জীবন, শিষ্যদের সাথে সাক্ষাৎ ও গালীলের দিকে যাত্রা, তারপর আকাশে (তাঁর) উর্ধাগমনের কথা বর্ণনা করা হয়, আবার অন্য দিকে এ ঐশ্বরিক দেহের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পদে পদে তিনি ইহুদীদেরকে ভয় পান এবং ইহুদীরা যেন তাঁকে দেখে না ফেলে সেজন্য সে দেশ থেকে তিনি গোপনে পলায়ন করেন, আর প্রাণ রক্ষার্থে গ্যালীলের দিকে সত্তর মাইল ব্যাপী পদযাত্রা করেন। আর বার বার নিষেধ করেন যেন এ ঘটনা কাউকে বলা না হয়। এ সবই কি ঐশ্বরিক দেহের গুণ ও লক্ষণ? না, বরং প্রকৃত ঘটনা হলো, ঐশ্বরিক বা নূতন কোন দেহ ছিল না, বরং কেবল সেই ক্ষত-বিক্ষত দেহই ছিল, যা প্রাণে রক্ষা পায়। আর ইহুদীদের দিক থেকে তবুও যেহেতু আশঙ্কা ছিল সেহেতু জাগতিক উপায়-উপকরণ অবলম্বনের বিষয়ে খেয়াল করে হযরত মসীহ্ সে দেশ ত্যাগ করেন। এর বিপরীতে যেসব কথা বর্ণনা করা হয় তা সবই বাজে ও অন্তঃসারশূন্য। যেমন বর্ণিত হয়েছে, ইহুদীরা পাহারাদার সৈন্যদেরকে ঘুষ দেয় এ সাক্ষ্য দেয়ার জন্য, সৈন্যরা যখন ঘুমিয়ে ছিল তখন মসীহ্‌র শিষ্যরা তাঁর শবদেহ চুরি করে নিয়ে গেছে? তারা ঘুমিয়ে থাকলে সঙ্গত কারণেই তাদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, ঘুমিয়ে থেকে তারা কী করে জানলো মসীহর লাশ তাঁর শিষ্যরা চুরি করে নিয়ে গেছে। আর কবর কেবল লাশ-শূন্য থাকায় কোন বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কী করে বুঝতে পারতো যে, মসীহ্ আকাশে উঠে গেছেন? দুনিয়াতে অন্য কোন কারণে কি কবরগুলো খালি পড়ে থাকে না? অতএব কবর থেকে আকাশে উঠে যাবার সময় এর সাক্ষ্য-প্রমাণস্বরূপ মসীহ্‌র দায়িত্ব ছিল কয়েক শ' লোকের সাথে দেখা করা এবং পিলাতের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করা। ঐশ্বরিক দেহ থাকতে তাঁর কিসের ভয় ছিল? কিন্তু তিনি এ পন্থা অবলম্বন করেন নি বরং বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে (নিজ সত্যতার) বিন্দুমাত্র কোন প্রমাণ পেশ না করে অত্যন্ত আতঙ্ক নিয়ে গালীলের দিকে পলায়ন করেন। কাজেই আমরা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস রাখি ও স্বীকার করি যে, প্রশস্ত ও জানালা বিশিষ্ট হাওয়াদার কবরটি থেকে তাঁর বেরিয়ে আসা এবং গোপনে হাওয়ারীদের সাথে সাক্ষাৎ করা সত্য হলেও তাঁর যে কোন অভিনব ও ঐশ্বরিক দেহ লাভ হয়েছিল তা কখনও সত্য নয়। বরং তাঁর সেই একই ক্ষত-বিক্ষত দেহ ছিল এবং তাঁর মনে অভিশপ্ত ইহুদীদের হাতে পুনরায় ধরা পড়ার সে একই আতঙ্ক ছিল। মথি লিখিত ইঞ্জিলের ২৮ অধ্যায়ের আয়াত ৭-১০ গভীরভাবে পড়ে দেখুন। এ সব আয়াতে স্পষ্ট লিখা আছে, মসীহ্ জীবিত আছেন ও গালীলের দিকে যাচ্ছেন বলে গোপনে সেসব মহিলাকে কেউ জানিয়ে ছিল এবং শিষ্যদেরকেও এ সংবাদ দেয়ার জন্য বলেছিল, সে মহিলারা তা শুনে অবশ্যই খুশী হয়েছিল, কিন্তু তখনও কোন দুষ্ট ইহুদী কর্তৃক তিনি ধৃত হবার আশঙ্কায় তারা (অর্থাৎ মহিলারা) মহা আতঙ্কিত মনে (শিষ্যদের উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হয়েছিল। আর ৯নং আয়াতে আছে ঃ 'ওই মহিলারা যখন শিষ্যদেরকে সংবাদ দিতে যাচ্ছিল তখন মসীহ্ তাদের সাথে দেখা করে সালাম বলেন।' আর ১০ আয়াতে আছে, যীশু তাদেরকে বলেন, 'ভয় করো না অর্থাৎ আমার ধৃত হবার আশঙ্কা করো না। তবে আমার ভাইদেরকে গালীলে যেতে বলবে। * সেখানে আমাকে তারা দেখতে পাবে। অর্থাৎ শত্রুদের আশঙ্কার দরুন এখানে আমি অবস্থান করতে পারি না।' মোট কথা, মসীহ্ (ক্রুশে) মারা যাওয়ার পর ঐশ্বরিক দেহ নিয়ে পুনর্জীবিত হয়ে থাকলে এর প্রমাণ দেয়া তাঁরই দায়িত্ব ছিল, যেন তিনি ইহুদীদেরকে তাঁর সেই ঐশ্বরিক জীবনের (সত্যতার) প্রমাণ পেশ করতেন। কিন্তু আমরা জানি, তিনি এর প্রমাণ উপস্থাপনের দায়ভার হতে মুক্ত হন নি। ইহুদীরা হযরত মসীহ্‌র পুনর্জীবিত হওয়ার প্রমাণ দেখাবার পথ রোধ করে দিয়েছিল- ইহুদীদেরকে এ অভিযোগ দেয়া প্রকৃতপক্ষেই এক প্রকাশ্য বাতুলতা। বরং মসীহ্ নিজেই তাঁর (তথাকথিত) পুনর্জীবনের স্বপক্ষে বিন্দুমাত্র প্রমাণ পেশ করেন নি। বরং পলায়ন, আত্মগোপন, খাদ্যগ্রহণ, নিদ্রাযাপন ও (নিজ দেহের) ক্ষত দেখানোর মাধ্যমে তিনি যে ক্রুশে মারা যান নি এরই প্রমাণ তুলে ধরেছেন। (চলবে)

অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

* টীকা ঃ এ স্থলে হযরত মসীহ্ সেই মহিলাদেরকে এ কথা বলে আশ্বস্ত করেন নি যে, তিনি এবার নূতন ও ঐশ্বরিক দেহ নিয়ে পুনর্জীবিত হয়েছেন। এখন কেউ তাঁকে আর ধরতে পারবে না। বরং মহিলাদেরকে দুর্বল দেখে সাধারণভাবে আশ্বস্ত করেছেন, যেমন কিনা পুরুষরা সর্বদা এমন অবস্থায় সেভাবে আস্বস্ত করে থাকে। মোটকথা, ঐশ্বরিক দেহের কোন প্রমাণ দেন নি বরং শরীরের মাংস ও হাড় দেখিয়ে সাধারণ প্রাণ দেহেরই প্রমাণ দিয়েছে। – গ্রন্থাকার

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর রাবে' (রাহেঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(০৮-০৪-০৩ তারিখে এম,টি,এ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত। অনুবাদকের কাজ করেছেন মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব)

প্রশ্ন নং ১ ঃ হারূত এবং মারূত কাদেরকে বুঝায়?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ এখানে হারূত এবং মারূত নামে যে ২ ফিরিশ্‌তার কথা বলা হয় তারা আসলে ফিরিশ্‌তা ছিলেন না। তারা ছিলেন ফিরিশ্‌তার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দু'জন বিশিষ্ট মানুষ। তাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে হযরত সুলায়মানের পক্ষে সেখানে কিছু কাজ করতে যেন সেখানে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করা যায়। সেখানে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল তা সঠিক ছিলো না, তা শিক্ষা - সম্মত ছিলো না। সেই অবস্থাকে পরিবর্তিত করে একটি বিপ্লব আনয়নের জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেখানে মানুষের মাঝে কিছু কথা ছড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন তাদেরকে এটিও বলা হয়েছে যে, তোমরা যে কথা ছড়াতে যাচ্ছ তা গোপন রাখতে হবে। তোমাদের স্ত্রীদের কাছেও গোপন রাখতে হবে। তোমাদের স্ত্রীরা সে কথা শুনলে তা সাধারণ মানুষের কাছে প্রচারিত হয়ে যাবে। আর যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো বিপ্লব আনয়ন করা। এ দু'জন মানুষ ছিলেন। ফিরিশ্‌তা ছিলেন না। যেভাবে মাওলানা শের আলী সাহেবকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাদিতে ফিরিশ্‌তা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন নং ২ ঃ পবিত্র কুরআনে খোদাতাআলা কাউকে নবী, কাউকে রসূল এবং কাউকে নবী ও রসূল উভয় নামে উল্লেখ করেছেন, এর তাৎপর্য কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ সকল আম্বিয়াকে নবীও বলা হয়েছে এবং রসূলও। তাঁদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। নবী হোক বা রসূল তা একই ব্যক্তির দু'টি উপাধি। পার্থক্য কেবল একটাই, নবী বলে যিনি ভবিষ্যতের খবর দেন। উম্মতের সামনে এসে খবর দেন- এ হবে তা হবে ইত্যাদি। রসূল বলে তাকে যিনি খোদার পক্ষ থেকে বাণী নিয়ে আসেন। নবী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জাতিকে সংবাদ দিয়ে থাকেন এজন্যে তাকে রসূলও বলা হয়। সুতরাং নবী ও রসূল একই।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ আল্ ঈমানো বায়নাল খওফে ওয়ার রেযা - এ হাদীসের ব্যাখ্যা কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ ঈমান ভয় এবং আশার মধ্যবর্তী অবস্থাকে বলে। ঈমানের ফলে ভয়ও সৃষ্টি হয় আর আশাও থাকে। যাদের ভিতর সত্যিকার ঈমান সৃষ্টি হয় তাদের মাঝে এ দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকে। আল্লাহ্‌তাআলার ওপর সত্যিকার ঈমান থাকলে মানুষের হৃদয়ে সত্যিকারের ভয় সৃষ্টি হয় এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি শাস্তি আসে তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

আল্লাহ্‌র ভয় এমন নয় যে, মনে কোন হিংস্র জন্তুর ব্যাপারে ভয় হয়ে থাকে। যেমন কোন সাপ দেখে মানুষ ভয় পায়। যে গর্তে সাপ থাকে সেখানে মানুষ হাত ঢুকাবে না বা যে জঙ্গলে হিংস্র জন্তু থাকে সেখানে মানুষ প্রবেশ করবে না কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলার ভয় এমন নয় যে, মানুষ আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে যায়। এ ভয়ের অর্থ হলো শয়তান থেকে দূরে যাওয়া আর আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ কুরআন করীমে সূরা নূহ্ এর ১৮ আয়াতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা ভূমি থেকে গাছের ন্যায় মানুষকে উদ্‌গত করেছেন। এর অর্থ কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ এর দু'টি অর্থ। একটি গভীর অর্থ এই যে, বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি দিলে জানা যায়, এক যুগ এমন ছিলো যে, সব কিছু মাটি থেকে সাক-সব্জীর মত উৎপন্ন হতো। Botanical life ছিলো। গাছ-পালার জীবনকে Botanical life বলে। Zoological life হলো একস্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করা। গাছ-পালা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে না। যেখানে জন্ম সেখানে শেষ হয়ে যায়। জীবের জীবন হলো চলা ফেরার জীবন। আল্লাহ্‌তাআলা প্রথমে **আমবাতাকুম মিনাল আরযে**-জমি থেকে উৎপন্ন করেছেন। আর কুরআনের অন্য স্থানে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন **হাল আতা আলাল ইনসা-নি হীনু মিনাদ্ দাহরি লাম ইয়াকুন শাইয়াম্মাযকূরা** - মানুষের ওপরে কি এমন যুগ আসে নি যখন সে উল্লেখের বস্তুই ছিলো না। এখন মানুষের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় মানুষ যখনই সৃষ্টি হয়ে আগে বেড়েছে সব সময় উল্লেখের বস্তুই ছিল। মানুষ কখন উল্লেখের বস্তু ছিলো না? যখন গাছ -পালার মত জীবন কাটাতে ছিলো। সেই সময় এর কোন উল্লেখ ছিলো না। একটি অর্থ এই। গাছ-পালার মত জমি থেকে আমি উদ্‌গত করেছি।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ সূরা আল্ কামারে ২৮-৩০ আয়াতে যে উষ্ট্রীর কথা বলা হয়েছে এর প্রকৃত স্বরূপ কী?

মাওলানা সাহেব আয়াতের অনুবাদ পড়ে দেন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ এ সেই উট্‌নী যার ব্যাপারে এ আদেশ ছিলো যেন এটাকে হত্যা করা না হয়। এটা ছিলো হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর উট। তিনি এর ওপরে চড়ে তবলীগের কাজ করতেন। তার জাতি তো তাকে অস্বীকার করে দিয়েছিলো। তিনি অন্য জাতিকে তবলীগ করতেন। এটা তার জাতির পসন্দ হচ্ছিলো না যে, অন্য জাতির মাঝে গিয়ে তবলীগ করে; তারা ইচ্ছা করলো উটনীর গোড়ালির রগ কেটে দেবে। অতএব হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে সতর্ক করলেন, দেখ, এ কাজ করবে না। আমার তবলীগের মাধ্যম এটি। যদি তোমরা এ উটনীকে হত্যা কর তাহলে তিন দিনের মাঝে তোমাদের ওপরে আল্লাহ্‌র আযাব নাযেল হবে। তাদের মাঝে একটি দুষ্ট লোক ছিলো সে দাঁড়িয়ে বল্লো, না আমরা কাটবোই। সে উটের গোড়ালির রগ কেটে দিলো। উট এর পরে চলতে না পেরে মারা গেল। তাদের ওপরে তাই আল্লাহ্‌তাআলার আযাব নাযেল হলো। আর তারা একেবারে বিনাশ হয়ে গেলো। তাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ কোন কোন লোক কোন কাপড় বা কোন রং বা কোন দিনকে তার সৌভাগ্যের কারণ বলে মনে করে থাকে। এর কোন গুরুত্ব আছে কি?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ না। এর কোন গুরুত্ব নেই। এসব কুসংস্কার। তবে সবুজ রং খুশীর চিহ্ন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত ছিলো সবুজ ইশতিহারে। সবুজ রং চোখকে আরাম দেয়। অন্য সব রং-এর দিকে তাকাতে চোখের মণিকে ছোট বা বড় করতে হয় আর সবুজ রং-এর সাথে চোখ সহজেই খাপ খাইয়ে নেয় ছোট বা বড় করতে হয় না। একজন বিজ্ঞানী বলেছেন, প্রকৃতির সর্বত্র সবুজ রং এর বাহার। রং-এর যদি কোন ইতিবাচক দিক থাকে তাহলে তা সবুজ রং। এ চোখকে জুড়ায়, আরাম দেয়। বাকী রং বা কাপড় অথবা দিন কোন শুভ-বার্তা বয়ে আনে না।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে কেউ যদি ঋণ করে ব্যবসায় বা ঘর-বাড়ী করতে চায় তাহলে তার ঋণের উৎস কী হবে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে ঋণ দেবে বায়তুল মাল। আসলে ইসলামী রাষ্ট্র হলে তবে। আর নামের ইসলামী রাষ্ট্র হলে তাকে ব্যাংক থেকে সুদে ঋণ নিতে হবে। জামাতে আহমদীয়া খোদার ফযলে এমন লক্ষ লক্ষ টাকা মানুষকে ঋণ দিচ্ছে। জামাত সুদে ঋণ নিতে নিষেধ করেছে। আর সুদ-মুক্ত ঋণ নেয়ার ব্যবস্থাও জামাতে রয়েছে। এ ধরনের ঋণ নিয়ে আল্লাহ্‌র ফযলে আহমদীরা ঘর-বাড়ী করছে। আর যখন ইচ্ছা টাকা ফেরৎ দিচ্ছে। এটাই সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ঋণের প্রক্রিয়া। এটা কেবল জামাতে আহমদীয়ার মাঝেই প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে তোমরা ন্যায়-বিচার কর। আর যারা ন্যায় বিচার করবে না তারা ধ্বংস হবে। বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে 'আদল' বা ন্যায়বিচারের মাপকাঠি কি?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ 'আদল' সম্বন্ধে তো কুরআন করীমে বলা হয়েছে- কোন জাতি যদি তোমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এমন জাতির সাথে ন্যায়বিচার করতে ভুলবে না। অবশ্যই তাদের সাথে ন্যায়বিচার করবে। যেসব জাতি তোমাদেরকে খানা কা'বা থেকে বের করেছে। যদিও এটা তোমাদের জন্যে খুবই কষ্টদায়ক, তবুও তাদের সাথে দেনা-পাওনা আচার-আচরণে কখনও ন্যায়বিচারকে হাত ছাড়া করবে না। এর ওপরে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কুরআনে আরও আয়াত আছে- নিজের আত্মীয়-স্বজন বা একান্ত আপনজন বা পিতা-মাতার বিরুদ্ধেও যদি সত্য সাক্ষ্য দিতে হয় তবুও সত্য সাক্ষ্য দেবে। এবং কখনও আত্মীয়-স্বজন নির্বিশেষে তা জলাঞ্জলি দিবে না বা নষ্ট হতে দিবে না। ইসলাম তো কামেল ইনসাফ ও আদলের শিক্ষা দিয়ে থাকে। যুগের অত্যাচারী শাসকের সামনেও প্রয়োজনীয় ন্যায় কথা বলবে। রাগ প্রকাশের প্রয়োজন নেই। ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে শাসকের বিরুদ্ধেও সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। আজকের পৃথিবীতে যে দুঃখ-কষ্ট ও অরাজকতা দেখা যাচ্ছে এর মূল কারণ হলো, মানুষ ইনসাফ ও আদলকে ছেড়ে দিয়েছে। আজ ইরাকে যে যুদ্ধ হচ্ছে এর মূল কারণ ন্যায় - বিচারকে তারা ভুলে বসেছে। যে জুলুম ও অত্যাচার তারা করছে এর ফলাফলও তারা অবশ্যই দেখবে। তারা এর প্রতিফল পাবে না এটা হতেই পারে না। তাদেরকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। সত্যিকারের আদল ও ইনসাফের শিক্ষা কুরআন করীমেই রয়েছে।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ ক্রুশের মৃত্যুকে অভিশপ্ত মৃত্যু বলা হয় কেন?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ বাইবেলে এটাকে অভিশপ্ত বা লা'নতী মৃত্যু নির্ধারণ করেছে। আর কোন কিতাবে একে লা'নতী মৃত্যু নির্ধারণ করে নি। কেননা, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে ইহুদীদের শত্রুতা ছিলো। এজন্যে তারা বাইবেলের বিধান অনুযায়ী মসীহ্‌র মৃত্যুকে লা'নতী সাব্যস্ত করে। এজন্যে তারা এটা প্রচার করে দেয়, আমরা তাকে ক্রুশে দিয়ে দিয়েছি। যদিও খোদা তাঁকে রক্ষা করে নিয়েছেন, লা'নতী মৃত্যুর ব্যাপারে পুরাতন বাইবেলের একটি কাহিনী চলে এসেছে। যাকে ক্রুশে ঝুলিয়ে মারা হয় তার মৃত্যু লা'নতী বা অভিশপ্ত। এর অর্থ এ-ও তো হতে পারতো যে, সাধারণ বিশ্বে কোন ব্যক্তিকে এতটা কষ্ট দিয়ে মারা হলে বাক্‌ধারার ভাষায় বলতো অভিশপ্ত মৃত্যু। ধর্মীয় ভাষায় এটাকে অভিশপ্ত মৃত্যু বলা হয় না। প্রথমে এ রকম মৃত্যুকে অভিশপ্ত মৃত্যু বলা হতো না। পরে ইহুদীরা ক্রুশে দিয়ে যে মৃত্যু দেয়া হয় একে অভিশপ্ত মৃত্যু বলা আরম্ভ করে।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ পঙ্গু শিশুর জন্মকে অনেকে পরীক্ষা বা খোদার আযাব বা শাস্তি বলে মনে করে। এটি আসলে কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ পঙ্গু সন্তান জন্ম হওয়া তো মোটেও আযাব নয়। এটাকে পরীক্ষা বলা যেতে পারে। পৃথিবীতে সবখানে সুস্থ, পঙ্গু, ধীর গতিসম্পন্ন লোক তীব্র গতি সম্পন্ন লোক, অন্ধ, বধির, লেংড়া, লুলা প্রভৃতি দেখা যায়। সবখানেই আপনি পার্থক্য লক্ষ্য করে থাকবেন। সুন্দর শিশু কুৎসিৎ শিশু রয়েছে এ পার্থক্য তো পৃথিবীতে সবখানেই লক্ষ্য করা যায়। এদের দেখার পরে কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হওয়া আবশ্যক। যারা বুদ্ধিমান লোক তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ওপরে খুশী হয়। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আমাদেরকে খোদাতাআলা এথেকে রক্ষা করেছেন। আঁ হযরত (সঃ) এ উপদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যখন উপরের শ্রেণীর দিকে দেখ, তখন চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর দিকেও দেখ। তুমি যদি তার চেয়ে ভাল থাক তাহলে খোদাতাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যদি নিজের উপরের শ্রেণীর দিকে তাকাও তাহলে লোভ-লালসা সৃষ্টি হবে। আর অবৈধ কাজের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে যাবে। এটা আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। আর ধৈর্যশীলকে আল্লাহ্‌তাআলা পুরস্কার দিতে থাকেন। একে আযাব বলা যেতে পারে না।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ রূহুল কুদুস আর রূহুল আমীনের মাঝে পার্থক্য কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ একটি সত্তার দু'টি নাম রূহুল কুদুস জিব্রাঈল (আঃ)-এর নাম আর রূহুল আমীনও তাঁর নাম। আমীন এ অর্থে যে তিনি বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যত ইলহাম বা কুরআন করীম নাযেল হয়েছে এর সবই রূহুল আমীনের মাধ্যমে নাযেল হয়েছে। জিব্রাইল (আঃ)-এর এক নাম রূহুল আমীন। তিনি আমানতের খেয়ানত করেন না। তাঁকে যা করতে বলা হয় তা তিনি করে দেখান।

প্রশ্ন নং ২ ঃ নামাযের সামনে এক লাইন ছেড়ে যাওয়া যায়। এক লাইন অর্থ কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ এক লাইন বলতে এক ব্যক্তির সিজদা করতে যে জায়গা লাগে ততটুকু। সামনে দিয়ে না যাওয়াই ভাল। নিম্নতম সীমা হ'ল একটি সিজদার স্থান। সিজদার কাছাকাছি দিয়ে গেলেও নামাযের ব্যাঘাত ঘটে। যদি যেতেই হয় দূর দিয়ে যাওয়া ভাল। আমাদের কাদিয়ানে এক বন্ধু ছিলেন। তার সামনে দিয়ে কোন ছেলে-পেলে গেলে তিনি খুব রাগ করতেন। কোন ছেলে-পেলে নামাযের সম্মুখ দিয়ে গেলে তিনি তাকে দৌড়ে গিয়ে মার-ধরও করতেন। যদিও এটা

আদেশের পরিপন্থী, মার-ধর করা উচিত নয়। নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া নিষেধ কিন্তু স্বয়ং নামাযী দৌড়ে গিয়ে মার-ধর শুরু করলে এটাতো মোটেই জায়েয নয়। নামাযের জন্যে এতটা জায়গা ছেড়ে যাওয়া উচিত যাতে নামাযীর নামাযের ব্যাঘাত না ঘটে।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ মহিলারা বিয়ের পর নামের সাথে স্বামীর নাম যুক্ত করে- এ প্রসঙ্গে ইসলামের শিক্ষা কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ কোন শিক্ষা নেই। নাম এজন্যে লাগায় যাতে মানুষ জানতে পারে যে, এ বিবাহিতা মহিলা আর কার স্ত্রী। এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এটা প্রচলিত প্রথা। এটা সুন্নত নয়।

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ মহিলারা বিয়ের এলান করতে পারে কি?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ আমার জ্ঞানমতে পারে না। যদি কোন পুরুষ না-ই থাকে সেক্ষেত্রে বিয়ে কার সাথে হবে?

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ নিকাহ্ ফরমে কোন গয়ের আহমদী সাক্ষী হতে পারে কি?

প্রশ্ন নং ১ ঃ হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ গয়ের আহমদী যদি সৎ ও বিশ্বস্ত হয় তাহলে তার সাক্ষী হওয়াতে কোন বাধা নেই। তাকে সাক্ষী বানানো যেতে পারবে।

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ দত্তক গয়ের আহমদী সন্তান কোন আহমদী পরিবারে বড় হলে তাকে কি আবার বয়াত নিতে হবে।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ ছোটবেলা থেকে তো তাকে আহমদী পরিবেশেই লালন পালন করা হয় এবং আহমদীয়তের শিক্ষাই তাকে দেখা হয়ে থাকে। গয়ের আহমদী শিক্ষা তো আর দেয়া হয় না সুতরাং সে আহমদীই হয়ে থাকে।

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ মাছ আর মাংসের মাঝে কোন্‌টি ভাল?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ আমার ধারণায় মাছ অধিক কল্যাণকর। মাছের প্রভাব ঠান্ডা। তা মাংসে নেই। মাংসের প্রভাব গরম এবং অপকার করে থাকে। মাছের তেল ডাক্তার ফুসফুসের শক্তির জন্যে ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ চা আর কফির মাঝে কোন্‌টি ভাল?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ এদের পৃথক পৃথক প্রভাব রয়েছে। কফি মানুষের ঘুম তাড়িয়ে দেয়। আমারও তাড়িয়ে দেয়। এক পেয়ালা কফি পান করলে অর্ধেক রাত পর্যন্ত ঘুমই আসে না; কিন্তু চায়ে এটা হয় না। চায়ের মাঝে এত নেশা নেই যতটা কফিতে রয়েছে। যাদের কফির নেশায় পেয়ে বসে তারা তো ১০/২০ কাপ পান করে থাকে। আমার দৃষ্টিতে উভয়ের মাঝে চা-ই অধিক কল্যাণজনক।

মাঝখানে হুযূর ঢাকার কালা চাঁদের দধি ও নাটোরের কাচাগোল্লার প্রশংসা করেন।

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ পবিত্র কুরআনের সূরা আল্ মু'মিন-এর ১২নং আয়াতে ২বার মৃত্যুও ২ বার জীবিত করার কথা দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? মাওলানা সাহেব আয়াতটি পাঠ করেন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ দু'বার জীবন লাভ করার কথাটিতো খুবই সুস্পষ্ট। প্রথমে মানুষ মৃত ছিল। **কুনতুম আমওয়াতান ফাআহ্‌ইয়াকুম** - তোমরা প্রথমে মৃত ছিলে পরে তোমাদেরকে জীবিত করলাম। মৃত মাটিকে প্রাণ দিয়ে দেয়া হলো। এটা এক বার জীবিত করা। আর মরার পরে জীবিত করা হবে। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের ২ বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং ২ বার জীবিত করেছেন।

সংকলন ঃ **নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী**

সংবাদ

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

গত ০৬/১০/০৩ইং সোমবার বাদ আসর আহমদীয়া মুসলিম জামাত আহমদনগর-এর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা বশীরুর রহমান সাহেব। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মোহতরম শরীফ আহমদ সাহেব কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সূচনা করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আইঃ) আহমদনগর জামাতের শিক্ষিত বেকারদের আত্মকর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীসহ স্থানীয় মজলিসে আমেলার সকল সদস্য ও স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের প্রজন্মরা যাতে বিশ্বব্যাপী ইসলাম তথা আহমদীয়তের প্রচার ও প্রসারে অবদান রাখতে পারে সেজন্য সকলেই দোয়া করেন।

- **মহিউদ্দীন আহমদ,**
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর

ওয়াকারে আমল

গত ০১/১১/০৩ইং তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ক্রোড়ার বাথরুম মেরামত করা হয়। উক্ত ওয়াকারে আমলে ৬ ঘন্টা সময় লাগে। উক্ত ওয়াকারে আমলে উপস্থিত ছিল স্থানীয় জামাতের কায়েদ সাহেব সহ ৬ জন খোদ্দাম।

- **জুয়েল আহমদ**
নায়েম সাকারে আমল

শোক সংবাদ

গত ০৯/১১/০৩ইং তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর এর দারুল মূসা মহল্লার প্রবীণ সদস্য জনাব হাসান আলী সাহেব সকাল ৮-০০টার সময় নিজ বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয় বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স ছিল প্রায় ৮৫ বছর। তিনি একজন সৎ, নেক ও নেযামের ইতায়াতকারী ছিলেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও নাতী-নাতনীসহ তিনি অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। তিনি একজন হিজরতকারী সদস্য ছিলেন এবং আহমদীয়তের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

আল্লাহ্‌তাআলা যেন মরহুমের বেহেশ্‌তের উচ্চতর মকাম এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সাবরে জামিল দান করেন, সেজন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন রইল।

- **মহিউদ্দীন আহমদ,** জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

পর্ব ৩ ঃ অধ্যায় ঃ ২

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মাঝে খোদা-সম্পর্কীয় ধারণা

ইতোপূর্বেই বিভিন্ন পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা প্রাশ্চাত্যের সমাজ বিজ্ঞানীদের তথাকথিত অভিমত যে, খোদা মানুষের ঈশ্বর নন, বরং মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট (God is a creation of man rather than being His creation)-এ ভ্রান্ত বিশ্বাসকে খন্ডন করেছি। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, শুধু মিথ্যা অনুমান (Mere conjecture) ছাড়া এ দাবীর সমর্থনে তাদের কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। অধিকন্তু ধর্মের ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা দেখিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস কোন মানবীর বিভ্রান্তি বা কুসংস্কারের ফলশ্রুতি নয় (not a product of human superstition)। পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি একেশ্বরবাদী ধর্মের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আমরা এ প্রশ্নের সমাধানের প্রমাণ পেয়েছি যে, আল্লাহ্‌ই মানুষের স্রষ্টা এবং যুগে যুগে মানুষের হেদায়াতের জন্য তিনি ঐশীধর্ম প্রেরণ করে থাকেন; কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের হস্তক্ষেপে ধর্মের সঠিক শিক্ষা পরে বিকৃত হয়ে পড়ে।

এ বিষয়ে আরো নিশ্চিত সিদ্ধান্তের জন্য এবারে আমরা অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাস পর্যালোচনা করে দেখতে চাই যে, খোদা সম্পর্কীয় ধারণায় বিবর্তন সংক্রান্ত সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী কতটুকু সঠিক? শুধু তাই নয়, খোদার অস্তিত্বের বিষয়ে নিরীক্ষামূলক কোন অনুশীলন ছাড়াই একটি পূর্ব-ধারণার বশবর্তী হয়ে একথা বলে দেয়া যে, খোদা বলে কিছু নেই- কতটা বিজ্ঞানসম্মত? কোন সুস্থ বিবেকই এ ধরনের অভিমতকে বিজ্ঞানভিত্তিক কোন উদ্যোগ হিসাবে মেনে নিতে পারে না, কেননা এখানে অনুসন্ধান শুরুর আগেই রায় দিয়ে দেয়া হয়েছে (where the verdict is already passed before the enquiry has begun)। তাছাড়া, কোন বিষয়ে অনুসন্ধানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি নীতিমালার আলোকে এ কর্ম সম্পন্ন করা হবে তা স্পষ্ট ভাষায় পেশ করা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্য যে, এ ধরনের কোন নীতিমালার কথা এসব সমাজ বিজ্ঞানী কোথাও সংজ্ঞায়িত করে নি। তাদের মনোভাব থেকে একটি মাত্র নীতির পরিচয়ই আমরা পাই যে, তারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণাটি সঠিক নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ কেন খোদা বা এ জাতীয় অস্তিত্বের উপাসনা করে (Why people worship God or godly images?) - এ প্রশ্নের উত্তর তারা গবেষণার মাধ্যমে খুঁজে দেখতে চায়। আর এ

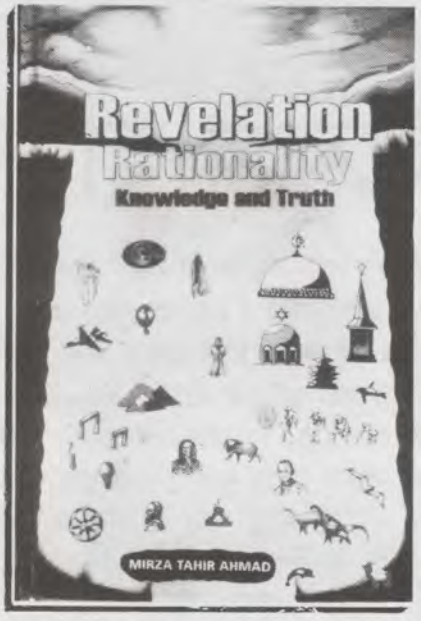

সংকটকে অতি সরলীকরণ করে পরিশেষে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, বিভিন্ন কুসংস্কার ও ভুল ধারণার শেষ সীমা হলো ভাবগত উপাদান হিসাবে খোদার অস্তিত্বের স্বীকৃতি (The growth of superstitions culminating in the creation of gods), আর এটাই তাদের অনুসন্ধানের একমাত্র বিষয় (is the only subject of their enquiry)। মনে হয়, এছাড়া তাদের নিকট অন্য কোন পথ খোলা নেই।

আলোচনার এ পর্বে আমরা অষ্ট্রেলিয়ার ধর্মের ইতিহাসের প্রতি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অষ্ট্রেলিয়া এমন একটি দেশ যার কৃষ্টিগত, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস খুবই প্রাচীন। কোন কোন গবেষক এটাকে ২৫ হাজার, কেউবা ৪০ হাজার আবার কেউ বা ১ লক্ষ ৩০ হাজার বছরেরও বেশি পুরাতন বলে মন্তব্য করেছেন। আর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে বিষয় তা হলো এই যে, এত দীর্ঘ সময় ব্যাপী খুব একটা বিচ্যুতি বা বিকৃতি ছাড়াই এসব ধর্মীয় বিশ্বাস তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে এখনো টিকে আছে।

কেননা প্রাচীন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐহিত্যের জন্য নয়, অষ্ট্রেলিয়া এমন একটি মহাদেশ যা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে শুধু পৃথকই নয়, এর মাঝে রয়েছে শত শত দ্বীপ, যার জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল একে অপর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকেছে (remained entirely isolated from each other)। এরা মূলত আদিবাসী সমাজ, যাদের সংখ্যা ৫ থেকে ৬ শতের মত। এ অসংখ্য আদিবাসী সমাজ দীর্ঘ ২৫ থেকে ৪০ হাজার বছর ব্যাপী তাদের সীমান্ত এলাকার জন্য উন্মুক্ত সাধারণ সীমানায় কদাচিত সংযোগ ব্যতিরেকে নিজেদেরকে একে অপর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রেখে জীবন-যাপন করেছে। এ বিভাজন তাদের চিন্তা, বিশ্বাস, উপকথা, কুসংস্কার সকল ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান। এটা যে তাদের ভাষার বিভিন্নতার জন্যই ঘটেছে তা-ই নয়, বরং একে অপরের সাথে সমাজবদ্ধতা ও প্রচলিত মূল্যবোধ বিনিময় করার অনাগ্রহ থেকেই জন্ম নিয়েছে (Traditional aversion for socialise and communicate with outsides)। আত্মকেন্দ্রিক এ মনোভাবের জন্য এ দ্বীপগুলো শুধু এলাকা হিসাবেই আলাদা থাকে নি, বরং তথ্য ও ভাব-বিনিময়ের জন্য এক অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধক (created an impassable barrier in the way of transfer of infromation from one to the other) হিসেবে কাজ করেছে।

সমাজতাত্বিকদের ব্যাখ্যা কতটুকু সঠিক, তা এসব আদিবাসী সমাজের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী বা কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। তারা এ কথার দাবীদার যে, প্রাথমিক পর্যায়ে আদিবাসী সমাজে বহু ঈশ্বর বা প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুরাজির উপাসনা করার রীতি পরিলক্ষিত হয়। কালক্রমে তাদের চেতনার বিকাশের সাথে সেই ধারণাই এক শক্তিমান ঈশ্বরের ধারণাতে পর্যবসিত হয় (evolving into belief in one Supreme God)। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার এসব ক্ষুদ্র বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর ধর্ম-বিশ্বাস পর্যালোচনা করে যা পরিলক্ষিত হলো তা কিন্তু এসব সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র, বরং তাদেরকে হতাশ করার মত ঘটনাই সেখানে দৃশ্যমান।

অষ্ট্রেলিয়ার এ আদিম অধিবাসীদের মাঝে বিনা ব্যতিক্রমে যে বিশ্বাস প্রচলিত তার মাঝে এক সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বরের ধারণা সার্বজনীন, যিনি সকল সৃষ্টির আদিকারণ (Without exception, there exists a beling in one supreme power who is the first cause of all creation) এ কথা সত্য যে, কোন কোন বিষয়ের সংজ্ঞা এসবের মাঝে সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান, কিন্তু নৃ-তাত্ত্বিকদের সর্ববাদীসম্মত মতামত এটাই যে, এসব আদিবাসী ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে সুউচ্চ ঈশ্বর (High Gods)-এর অস্তিত্ব খুবই পরিচিত, যিনি সমস্ত সৃষ্টির আদিকারণ। সুউচ্চ ঈশ্বর মূলত অন্যান্য সুপরিচিত ধর্মের আল্লাহ্ ঈশ্বর ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নয় (they all invearably believe in the existence of that ultimate first cause called a 'High God' - another name for Allah, God, Brahma and Paramatma etc.)। (চলবে)

সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ - অধ্যাপক মোহাম্মদ আমীর হোসেন

চতুরঙ্গ

দুর্জনেরে হানো!

কাদিয়ানীদের সামাজিকভাবে বর্জন করার আহ্বান ও কাদিয়ানী মসজিদের ইমামকে হত্যা করা, এ দুই ঘটনার মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা, আমার জানা নেই। তবে দুটি ঘটনাই ঘটেছে একই অঞ্চলে, খুব কাছাকাছি জায়গায়। দেশের অন্য কোন অঞ্চলে যখন এ ধরনের ঘটনা ঘটার কথা শোনা যায় না, তখন এ অঞ্চলে এমনটি ঘটে কেন? কোন ধর্মান্ধ শক্তির আধিপত্যের কারণে কি?

এ কী দুর্দৈব!

মনজুরে মওলা

এই তো কিছুদিন আগে, অক্টোবর মাসের (২০০৩) তেইশ তারিখে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এক সীমান্তবর্তী জেলার এক জায়গায় সুন্নি মুসলমানদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে-সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ওই 'এলাকার কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ১৪টি পরিবারকে সামাজিকভাবে বয়কট, তাদের কাছে কোন মালামাল বিক্রি ও বাক্যালাপ না করার জন্য' মাইকে ঘোষণা দিয়ে সবাইকে অনুরোধ করা হয় ('জনকণ্ঠ', ০৮-১১-০৩, 'ইত্তেফাক' থেকে উদ্ধৃত)। এক সপ্তাহ যেতে-না-যেতেই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেই, ওই এলাকা থেকে বেশি দূরে নয়, এমন এক জায়গায় অক্টোবরের একত্রিশ তারিখে, রোজার মাসে, এক কাদিয়ানী মসজিদের প্রৌঢ় ইমামকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। শুধু তা-ই নয়, নামাজের পর মুসল্লিদের ওপর হামলা চালানো হয় এবং তাতে কয়েকজন আহত হন। মসজিদের দরজা-জানালা ও ইমামের বাড়ি ভাংচুর করা হয়। নিহত ইমামের স্ত্রী দেড় শ' জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে স্থানীয় সুন্নি মসজিদের ইমামও আছেন। তিনি আবার ক্ষমতাসীন সরকারের অংশী একটি ধর্মভিত্তিক দলের কর্মী ('জনকণ্ঠ', ০২-১১-০৩)।

এই উপমহাদেশের একটি দেশে কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণা করা হয়েছে। এই দেশেও এক সময় কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণা করার দাবি উঠেছিল। ওই দাবি মানা হয়নি। ওই দাবি যে আবারও উঠবে না, কে বলতে পারে! যদি ওঠে, তাহলে যে ওই দাবি এখন মেনে নেয়া হবে না, তা-ইবা কে বলতে পারে! এমনটি যদি হয়, যদি ওই দাবি ওঠে ও তা মেনে নেয়া হয়, তাহলে রাষ্ট্রের এখনকার ধারণার সঙ্গে একটি নতুন– এবং আমার বিবেচনায়, অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয়– মাত্রা যুক্ত হবে। মেনে নেয়া হবে যে, ধর্ম সম্পর্কে রায় দেয়ার অধিকার ও ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে, একটি বিশেষ ধর্মের বিশ্বাসীদের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্যতা কার আছে এবং কার নেই, এটি নির্ধারণ করার অধিকার রাষ্ট্রের আছে। না, নেই। শুধু রাষ্ট্রের কেন, এ অধিকার কোন মানুষেরই নেই। কার বিশ্বাস সঠিক ও গ্রহণযোগ্য, আর কার বিশ্বাস সঠিক নয় ও গ্রহণযোগ্য নয়, তা কেবল মহান আল্লাহ্‌তায়ালাই বলতে পারেন। যা কেবল মহান আল্লাহ্‌তায়ালারই অধিকার, কোন মানুষ (নাউজুবিল্লাহ) তা নিজের বলে প্রয়োগ করতে পারে না। মাফ করে দেয়ার অধিকারও কেবল মহান আল্লাহতায়ালার। তিনি পরম করুণাময়, পরম ক্ষমাশীল।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে যে-সংবিধান রচনা করা হয়, তার প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সাংবিধানের মূলনীতি হইবে'।

১৯৭৮ সালে, এখনকার প্রধান সরকারী দলের প্রতিষ্ঠাতা ক্ষমতায় থাকার সময়, 'দ্য সেকেন্ড প্রোক্লামেশন (ফিফ্‌টিন্‌থ এমেন্ডমেন্ট) অর্ডার' জারির মাধ্যমে এ অনুচ্ছেদটি পরিবর্তন করে 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে' বাক্যবন্ধটির জায়গায় 'জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে'র কথাটি এবং 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার' বাক্যবন্ধটির জায়গায় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের' কথাটি লেখা হয়। মুক্তিযুদ্ধ হয়ে যায় কেবল স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ, মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি পুরোপুরি বাদ পড়ে যায়। একই আদেশবলে 'রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি' শীর্ষক সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের অনুচ্ছেদ ৮ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা তুলে দেয়া হয়। মূল সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, 'ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য/(ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা,/(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান,/(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার,/(ঘ) কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন/বিলোপ করা হইবে।' কাদিয়ানীদের ওপর উল্লিখিত অত্যাচার এই (ঘ) পর্যায়ে পড়ে। এই অনুচ্ছেদ তুলে দেয়ার ফলে ধর্মবিশ্বাসের কারণে নিপীড়নের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার কোন সাংবিধানিক দায়িত্ব আর রাষ্ট্রের রইল না। দুর্নীতির দায়ে আদালতে দণ্ডিত এক সময়ের এক সেনাপতি যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন, ১৯৮৮ সালে, 'সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন' দ্বারা সংবিধানের প্রথম ভাগে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় প্রতীক কী হবে, তা বলার আগে, '২ক' ক্রমিক চিহ্নিত একটি নতুন অনুচ্ছেদ যোগ করে বলা হয়, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।' কোন্ ইসলাম? সুন্নি ইসলাম, শিয়া ইসলাম, ইসমাইলী সম্প্রদায়ের ইসলাম, আহমদিয়াদের ইসলাম, যে ইসলামে আজানের সময় হজরত আলীর নাম বলা হয় ও প্রকাশ্যে রাসুলুল্লাহর (সাঃ) ও হজরত আলীর ছবি বিক্রি হয় (ইরানে যেমন), সেই ইসলাম, কিংবা ইসলামের অন্য সম্প্রদায়গুলোর কোন একটির ইসলাম? না, তেমন কিছু বলা হয়নি। তার মানে, ইসলামে যত সম্প্রদায়ই থাকুক না কেন, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ও সম্প্রদায়ের উর্ধে উঠে যে শাশ্বত ইসলামের অবস্থান, তা-ই এদেশের রাষ্ট্রধর্ম। কাদিয়ানীদের যেহেতু অমুসলমান ঘোষণা করা হয়নি, সেহেতু তাঁরা যে ধর্মের চর্চা করেন– তাঁরাও তো নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন– তাকে ইসলাম বলেই মানতে হবে। যে প্রজাতন্ত্রে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হওয়া সত্ত্বেও অন্য সব ধর্মাবলম্বীদের শান্তিতে নিজ নিজ ধর্ম পালনের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, সে প্রজাতন্ত্রে ইসলাম ধর্মেরই কিছু মানুষ শান্তিতে তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে না, এ কেমন করে হতে পারে?

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মানুষেরা, আমি যতদূর জানি, রাসুলে করিম হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)কে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসাবে মানেন ও শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু সর্বশেষ নবী হিসাবে নয়। ইসলাম ধর্মের অন্য অনুসারীরা এটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। না-ইবা করলেন, কিন্তু সেজন্য তাঁরা অসহিষ্ণু হবেন কেন, শক্তিমত্তা প্রয়োগ করতে যাবেন কেন? কাদিয়ানীরা সংখ্যালঘু বলে? মুসলমান হয়েও কাদিয়ানীরা যদি নিরাপত্তা সমস্যায় ভোগেন, তাহলে এ দেশের অন্য ধর্মাবলম্বীরা নিরাপত্তা পাবেন কি করে? লা কুম দ্বীনুকুম ওয়াল ইয়া দ্বীন, তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার, ইসলামের এই মহান ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক আদর্শ কোথায় গেল? আমি কোথাও পড়ে থাকব বলে মনে পড়ে– উইলিয়াম মুইর-এর বইয়ে? ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর বইয়ে?–হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় অমুসলমানরা সন্ধিপত্রে 'রাসুলুল্লাহ্' শব্দটিতে আপত্তি করেছিল এই বলে যে, তারা তো রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে রাসুলুল্লাহ্ বলে মানে না, যে দলিলে এ শব্দটি লেখা আছে, সে দলিলে সই করা মানে তো তাঁকে রাসুলুল্লাহ্ বলে মেনে নেয়া। মুসলমানরা সন্ধিপত্রটি থেকে শব্দটি বাদ দিতে রাজি হয়নি। তখন নাকি রাসুলে করিম (সাঃ) নিজেই শব্দটি বাদ দিয়েছিলেন।যদি এটি সঠিক হয় তবে, এই ঘটনার তাৎপর্য তিনটি। এক, রাসুলে করিম (সাঃ) তো রাসুলুল্লাহই; কেউ তা মানুক বা না মানুক, তাতে কিছু এসে যায় না। দুই, যুদ্ধের চাইতে, সংঘর্ষের চাইতে শান্তি বড় এবং শান্তির স্বার্থে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করা যায়। তিন, সবারই মতের ও মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা জরুরী। এই রাসুলে করিম (সাঃ)-এর উম্মত হয়ে আমরা ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারি? কেন হব?

কাদিয়ানীদের সামাজিকভাবে বর্জন করার আহ্বান ও কাদিয়ানী মসজিদের ইমামকে হত্যা করা, এ দুই ঘটনার মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা, আমার জানা নেই। তবে দুটি ঘটনাই ঘটেছে একই অঞ্চলে, খুব কাছাকাছি জায়গায়। দেশের অন্য কোন অঞ্চলে যখন এ ধরনের ঘটনা ঘটার কথা শোনা যায় না, তখন এ অঞ্চলে এমনটি ঘটে কেন? কোন ধর্মান্ধ শক্তির আধিপত্যের কারণে কি? কারণ যা-ই হোক না কেন, এ অঞ্চলের কাদিয়ানীরা, স্পষ্টতই বোঝা যায়, এখন বিশেষভাবে বিপন্ন, শুধু বিপন্নই নয়, সহিংসতার শিকার। তাঁরা হয়ত ভয়ে-ভয়ে আছেন, যে কোন সময় তাঁদের ওপর আবারও হামলা হতে পারে, কিংবা অন্যভাবে তাঁদের নিপীড়ন করা হতে পারে। তাঁরা এ দেশেরই মানুষ এবং এ দেশের অন্যসব মানুষের মতো শান্তিতে বাস করার ও শান্তিতে নিজেদের ধর্ম পালন করার অধিকার তাঁদের আছে। তাঁদের রক্ষা করা, শক্তি দেয়া, সাহস দেয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য–'দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো'।

সৌজন্যেঃ দৈনিক

নভেম্বর ১১, ২০০৩

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস্ (রাহেঃ)

হযরত মির্যা নাসের আহমদ বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তৃতীয় খলীফা। খলীফা নির্বাচিত হবার আগে তিনি ছিলেন সদর আঞ্জুমানের সদর (প্রেসিডেন্ট)। তিনি আনসারুল্লাহ্‌রও সদর ছিলেন। তখন আনসারদের ইজতেমায় একবার শিকারের পাখীর মাংস খাওয়ান হয়েছিল। পরে সংখ্যা বৃদ্ধি হবার কারণে আর তা সম্ভব হয় নি। তিনি খোদ্দামেরও সদর ছিলেন। আর সদর খোদ্দাম থাকাকালীন মৌলিক বহু কাজ করেছেন। খোদ্দাম এবং আনসারের নিয়মকানুন এবং বিভাগগুলো প্রস্তুত করার পেছনে তাঁর পরিশ্রম অনেক বেশি।

তবে শিক্ষালয়গুলোর প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলোর মান উন্নয়ন প্রকল্পে তিনি অবিরাম সংগ্রাম করেছেন। কারণ তখন জামাতের আর্থিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। তদুপরি উপযুক্ত শিক্ষককে উপযুক্ত বেতন দিয়ে নিযুক্ত করাও সম্ভব ছিল না। তাই জামাতের যাঁরা শিক্ষক ছিলেন তারাও যথেষ্ট কুরবানী করেছেন। হযরত খলীফা সালেসের তত্ত্বাবধানে এবং জামাতের বুযুর্গ শিক্ষকদের প্রচেষ্টায় আমাদের স্কুল ও কলেজ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। কেবল লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই নয় বরং খেলাধূলায়ও বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি ছিলেন হাফেয। কাদিয়ানে ধর্মীয় শিক্ষার পর লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজে লেখাপড়ার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য অক্সফোর্ডে গিয়েছিলেন এবং ইকনমিক্সে এম এ পাস করেন। জামেয়া আহমদীয়ার প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি। আর তা'লীমুল ইসলাম কলেজের প্রিন্সিপালও ছিলেন খলীফা হবার পূর্ব পর্যন্ত। এ ছোট্ট প্রবন্ধে আমি তাঁর নিকট যা শুনেছি এবং যা দেখেছি এর কিয়দংশ উপস্থাপন করছি।

তিনি বলেছেন, আমার তরবিয়ত আম্মাজান নসুরৎ জাহানের হাতেই হয়েছে। একবার কাদিয়ানে কোন গরীব লোক মারা যান। আম্মাজান সহানুভূতি জানাতে ও তাদেরকে দেখতে তাদের ঘরে যান। খাবার সময় হলে সবাই মাটিতে বসে খেতে শুরু করেন। আমি এভাবে খেতে অভ্যস্ত ছিলাম না। তাই খাই নি। ঘরের সবাই আমার জন্য চিন্তিত। আম্মাজান বললেন, আপনারা মোটেই অস্থির হবেন না। ক্ষিদে পেলে আর খেতে হলে সবার সাথেই খেতে হবে। এ তরবিয়ত আজীবন কাজে এসেছে। জীবনে অনেক সময় এসেছে, যখন বসার জায়গাও ছিল না। তিনি বলেছেন, আব্বাজান মুসলেহ মাওউদ আমাদের কোন বৈধ সখে বাধা দেন নি। তবে অতিরিক্ত সখ পুরো করার দায়িত্ব আমাদেরই ছিল। লাহোরে লেখাপড়ার সময়ে আমার সাইকেলের দরকার ছিল। নিজে বলতে সাহস করি নি। আম্মাজান বলেছেন। সে সাইকেল হারিয়ে যায়। কাউকে বলা হয় নি। অনেক চেষ্টা ও কষ্ট করে অর্থাৎ একবেলা খেয়ে সে সাইকেল আবার কেনা হয়েছে। এগুলো অত্যাচার নয়। জীবনে বহু ক্ষেত্রেই এর সুফল পেয়েছি। হযরত খলীফা সালেসের (রাহেঃ) তরবিয়তের ক্ষেত্রই ছিল আলাদা।

আমাদের বিয়ে হবার পর আমরা যখন তাঁর সাথে দেখা করার জন্য যাই, তখন তিনি প্রথমে আমার স্ত্রী হাজেরাকে ডাকেন এবং পরে আমাকে ডাকেন ও বলেন, তোমার উপস্থিতিতে হয়ত বলতে ইতস্ততঃ করবে, তাই তাকে পৃথক ভাবে ডাকা হ'ল। রাবওয়ার কাছে আহমদনগরে তাঁর জমি। সেখানে কমলার বাগান, পেয়ারার বাগান। প্রায়ই আসরের পর তিনি সেখানে যেতেন। একবার আমাদেরকে বাগান থেকে মাল্টা দিচ্ছিলেন, দেখ কোন্ গাছের মাল্টার স্বাদ কেমন। আমি একটি খেয়ে ফেলি। তিনি আমাকে আরেকটি দিলে সেটিও খেতে আরম্ভ করলে, তিনি বারণ করে বললেন, এটি রাখ। হাজেরাকে দিও। প্রথমতঃ প্রথমটার অর্ধেক রাখা উচিত ছিল।

১৯৭৯ সালে যখন সদর খোদ্দামুল আহমদীয়ার নির্বাচন হয়। তখন আমার নামও প্রস্তাব করা হয়। আমি ভোটে পঞ্চম ছিলাম। তিনি আমাকে মনোনয়ন দেন। যেহেতু আমি অনেক জুনিয়র তাই আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম এবং ভয় পাচ্ছিলাম। কারণ রাবওয়ার বাইরের লোকদের সাথে আমার তত পরিচয় ছিল না।

আমি রাবওয়ার কায়েদ থাকার ফলে রাবওয়ার খোদ্দাম সবাই আমাকে ভোট দেয়। আমার নাম লাহোর মজলিস হতে প্রস্তাব করা হয়। যাহোক আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়ি। এমনকি ইজতেমার পরের দিনই হুযূরকে (রাহেঃ) বলি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি সদরের দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত নই। তিনি আমাকে বসতে বল্‌লেন। তিনি কোন চিঠি পড়ছিলেন, তা শেষ করে বললেন, এ কথাটি যদি মনে রাখ যে, 'তুমিই সব কাজ করতে পারবে আর মনে যদি কোন অহংকার আসে তবে সফল হবে না। আমি দোয়া করব। আমাকে স্মরণ করাবে দোয়ার জন্য। আর অসুবিধা হলে পরামর্শ করবে।'

একবার আমাদের সালানা ইজতেমা হচ্ছিল। চৌদ্দ শতাব্দীর শেষ ও পনর শতাব্দীর প্রথম ইজতেমা। অনেক লোক ইজতেমায় এসেছিল। মনে হচ্ছিল যেন জলসা সালানা। হুযূর নিজেই বলছিলেন, এটা ইজতেমা না কি জলসা! যাক ইজতেমার দিনে যুহরের নামাযের পর আমাকে বললেন, বেশি বেশি ইস্তিগফার পড়। আমি তো খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি। আমি মনে করেছিলাম, হয়ত স্বপ্ন দেখেছেন। সেদিন ইজতেমার বক্তৃতায় তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার কামিয়াবী, ইজতেমা আর এ অধমের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, এ জামানার উন্নতি খলীফার নেতৃত্বে এবং খলীফার দোয়াতে। আমি জামাতকে এ শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। আর আমাকে তিনি এ তরবিয়ত দিয়েছেন, উন্নতি দেখে যেন মনে অহংকার না আসে। অহংকার শয়তানের কাজ। উন্নতি দেখে আরো নীচু হও। ইস্তিগফার পড়। বেশি বেশি দুরূদ পাঠ কর।

তিনি কোন কোন বিষয়ে ভাল ভাবে গবেষণা করেছেন। যেমন মৌমাছির সম্পর্কে তিনি গবেষণা করেছেন। কারণ কুরআন মজীদে মৌমাছি আর মধুর উল্লেখ আছে। সোয়াবিন সম্পর্কেও তিনি অনেক পড়াশুনা করেছেন। তাঁর একটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি।

তিনি খুবই অল্প খেতেন। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং শান্ত নিরিবিলি স্থান পসন্দ করতেন। রাবওয়া হতে ইসলামাবাদ সফরকালে সব সময় ক্যানাল রোড দিয়ে যাতায়াত পসন্দ করতেন। তিনি বলতেন,

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর কম খাওয়াটা আম্মাজানের শিক্ষা। রূহানী নেতাগণ মনোবিজ্ঞান জানেন। তিনি বলেছেন, ছোটদের জন্য লেখা, আর ছোটদের কাছে বক্তৃতা করা সহজ নয়। তাই আতফালের সভায় দশ মিনিট বক্তৃতা যথেষ্ট। আর দশ মিনিটের সঠিক ব্যবহার করতে হলে সরল ভাষা ও সহজ বিষয় বলার জন্য যথেষ্ট চিন্তা করা দরকার। মহিলাদের বেলায় তিনি যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। যেমন কোথাও গেলে মেয়েদের বসার স্থান, মহিলাদের গোসলখানা, পেসাব-পায়খানার ব্যবস্থা আছে কিনা সফর আরম্ভ করার আগেই এর খোঁজ- খবর নিতেন। একবার কাসরে খিলাফত হ'তে মহিলা জলসাগাহের পাশ দিয়ে পুরুষদের জলসাগায় যাবার সময় শোরগোল শুনা যাচ্ছিল। আমি বল্লাম, আমাদের জলসায় এত শোরগোল হয় না। তিনি বল্লেন, তোমরা সবাই একটি বাচ্চা সাথে নিয়ে যেও। দেখব কেমন শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি কর। মা বেচারী কাউকে দুধ দিচ্ছে। কেউ পেশাব করছে ইত্যাদি।

বিল্ডিং তৈরীর বেলায় তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা ছিল। শিক্ষালয় যেমন, তা'লীমুল ইসলাম কলেজ তাঁরই পরিশ্রমের ফল। প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিস অনেক বড় বিল্ডিং। এ ইমারত এবং কাসরে খিলাফত বানানোর সময় দেখেছি তিনি কীভাবে ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্টদের ক্লাস নিয়েছেন। তার নীতি ছিল, প্রথমে দালানের মজবুতি দেখতে হবে, তারপরে সৌন্দর্য। দুর্বল শরীরে সুন্দর পোশাকে কয়দিন কাটবে।

তিনি বলেছেন, কাজ পরিবর্তনও এক রকমের আরাম। যেমন লিখতে লিখতে পরিশ্রম বোধ হলে, পড়া আরম্ভ কর আরাম বোধ করবে। তিনি বলেছেন, ইসলামী ইবাদতের বহু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন চলাফেরা, উঠাবসা, সাইকেল বা মোটর চালানোর সময় সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ আকবর যতবার পড়বে তোমার Bank Balance (অর্থাৎ পুণ্য-ভান্ডার) ততই বাড়বে। অথচ কাজের কোন ব্যঘাত ঘটবে না। তিনি বলেছেন, একবার কলেজে ছাত্রদের ভর্তির সময় আমি প্রত্যেক ফরমে দস্তখত করতে গিয়ে সুবহানাল্লাহ্ পড়েছি। সেসময় আমি চারশ' ফরমে দস্তখত করেছি। সুতরাং চারশ' বার সুবহানাল্লাহ্ পড়া হয়েছে।

আতফালদের 'কুলু জামিয়া' অর্থাৎ এক সাথে খাওয়া দাওয়া করা। এর বিশেষত্ব ও ফায়দা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ওলীমার দাওয়াতে প্রায়ই দেখা যাবে এখানে হাড্ডি, তো ওখানে পোলাও। ওলীমার পর জায়গাটি পরিষ্কার করতে বেশ পরিশ্রম হয়। আতফালদের জন্য কুলু জামিয়ার প্রোগ্রামটি এ কারণে করা হয়েছে যাতে তারা ছোটবেলা থেকেই ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মূল্য বুঝতে পারে। আবার মিলে-মিশে খাওয়ার আদব-কায়দাও শিখতে পারে। আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে শৈশব হতেই সজাগ হতে পারে। আমরা এ প্রোগ্রাম শুরু করেছি, আর খলীফাতুল মসীহ্ (রাহেঃ) এর অনুমোদন দিয়েছেন। মনে রাখবেন, যে বিষয়গুলো খলীফাতুল মসীহ্ অনুমোদন করেন এর অবশ্যই বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। অনেকে বুঝতে না পেরে আপত্তি করে বসে।

তাঁরই উদ্যোগে খোদ্দামগণ সাইকেল সফরও আরম্ভ করে। তেমনি ঘোড়ার সফরও তাঁর উদ্যোগে জামাতে প্রচলন হয়। তারপর ব্যায়াম। আর এ ব্যাপারে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করার জন্য তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সাইকেল এমন বাহন যা প্রায় সকলেই ক্রয় করতে পারেন। Maintenance ও সহজ। আর বড় দু'টি শর্ত হলো (১) Exercise হয় (২) বিকল্প পথ। যেমন রাবওয়া হতে বের হলে সাইকেলে নিরাপদে ছোট ছোট পথ দিয়ে যাতায়াত নিরাপদ হবে। আর সাইকেল চালালে বেশ ব্যায়াম হয়। হল্যান্ডে নূন স্পিট এরিয়াতে সাইকেলে লোকজন চলাফেরা করে। সম্প্রতি জাপানে দেখেছি বেশ সংখ্যক লোক সাইকেলে চলাফেরা করছে। অনেক বুড়ো লোককেও সাইকেল চালাতে দেখেছি। একজন বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বয়স কত? বললেন, আমেরিকা যে বছর এটম বোমা দ্বারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছিল তখন আমি ছিলাম ৩৫ বছরের। তাহলে এখন তার আশি বছর। আমাদেরতো আনসার হলেই আরামের কথা উঠে। ঘোড়া সম্পর্কে খলীফা সালেস (রাহেঃ)-এর মন্তব্য ছিল, ঘোড়া কয়েকশ' মাইল দৌড়ালেও কাতর হয় না। আধুনিক যান-বাহনের ব্যাঘাত ঘটলে ঘোড়া দিয়ে উপকার হবে। তবে ঘোড়া সওয়ারীর দক্ষতা থাকতে হবে। আর তাঁর (রাহেঃ) অভিজ্ঞতায় আরবী ঘোড়া পটু ও সাহসী। তিনি নিজেও ঘোড়া রেখেছেন। সেখানে অনেক খোদ্দাম ঘোড় সওয়ারী হওয়া শিখেছে।

আরেকটি বিষয় লিখে আমি এ প্রবন্ধ শেষ করছি। তিনি বলেছেন, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে যেমন, কাদিয়ানে যখন আহরারীর সভা হয়, তখন তারা জামাতকে চিরতরে শেষ করার হুমকী দিয়েছিল। তখন জামাতের লোক সংখ্যা তত ছিল না। যারা সেই দুরবস্থার মোকাবেলা করেছেন তারা আমাদের সাথে অনেক গল্প করেছেন। তারা একথাও বলেছেন, ১৯৫৩ সালে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে যে লজ্জাকর হাংগামা হয়েছে, তাতে জান ও মালের ক্ষতি হয়েছে। তবে আল্লাহ্ তাঁর চিরাচরিত নিয়ম প্রদর্শন করেছেন এবং জান ও মালের দিক দিয়ে জামাতকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। এসব ব্যাপারে জনাব আবদুল আযীয বাসড়ী সাহেব খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সাথে আমার অনেক কথা হয়েছে। বর্তমানে তিনি দুনিয়াতে নেই। আল্লাহ্ তাঁর রূহকে উচ্চাসন দান করুন।

হযরত খলীফা সালেস্ এ বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, অবশ্যই নিজের হেফাযত করবে। তবে অপরকে কষ্ট দিবে না। কারণ প্রথমতঃ হযরত রসূল করীম (সঃ) আত্মরক্ষা করছেন, আক্রমণ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ মহানবী (সঃ)-এর গোলাম ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর বয়াতের শর্তে এ কথা রয়েছে, 'আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন জীবকে বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না'।

তাই মানুষকে কষ্ট দেয়া, দুঃখ-যন্ত্রণা দেয়া আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। কষ্ট ও গালি শুনে দোয়া দেয়ার কথা হযরত মসীহ্ মাওউদ বলেছেন।

এটা ধ্রুব ও চির সত্য যে, হক কথার প্রচারে মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, আর তখনই ধৈর্য দেখাতে হবে।

- মাওলানা মাহমুদ আহমদ
আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, অষ্ট্রেলিয়া

সেই রক্তাক্ত শাহাদত বরণের ঘটনা

যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার রঘুনাথপুর বাগ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট শাহ্ আলম চিহ্নিত ধর্মীয় সন্ত্রাসীচক্রের হাতে গত ৩১শে অক্টোবর শুক্রবার শাহাদত বরণ করেছেন। এ ঘটনায় দেশের শান্তিকামী মানুষ উদ্বিগ্ন ও শংকিত হয়ে পড়েছে। ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ অত্যন্ত নৃশংসভাবে পাশবিক উপায়ে বেদম প্রহার করে শাহ্ আলমকে শহীদ করে উল্লাস ধ্বনিতে ফেটে পড়ে। শুক্রবার জুমুআর দিন প্রকাশ্য দিবালোকে আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদে ঢুকে ভাংচুর ও নিজ বাড়ীতে ধর্মীয় আলোচনায় ব্যস্ত নিরস্ত্র নিরীহ শান্তি প্রিয় আহমদী মুসল্লীদের উপর লাঠিসোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে উগ্রবাদী কট্টরপন্থী ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী। পবিত্র রমযানে উগ্রবাদী সন্ত্রাসীরা দানবীয় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে রঘুনাথপুর বাগে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির উদ্ভব করে। মাহে রমযান মাসেও দানবীয় সন্ত্রাসীচক্রের অপতৎপরতা বন্ধ হয় নি। দেশে একের পর এক লাশ পড়ছে। কিন্তু কোন ক্রমেই যেন সন্ত্রাসবাদকে অবদমিত করা সম্ভব হচ্ছে না। শাশ্বত সত্য ধর্মের নামে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে জঘন্য মানবতা-বিধ্বংসী বর্বরোচিত হত্যাকান্ড সংঘটিত করে দানবীয় শক্তি নিরাপদে সটকে পড়ছে। রঘুনাথপুর বাগ গ্রামের আহমদীয়া নেতা শাহ্ আলমের হত্যাকারীদের ধৃত করা খুব কি কঠিন কাজ? একটি মসজিদের ইমাম তার সশস্ত্র বাহিনী ও সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে প্রগতিশীল ও বিকাশমান আন্তর্জাতিক ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের নিষ্ঠাবান শান্তিপ্রিয় মানুষের উপর নিষ্ঠুর হামলা ও ভাংচুর করার সাহস পায় কোত্থেকে? কোন্ খুঁটির জোরে স্থানীয় মসজিদের ইমাম আমিনুর রহমান এলাকার প্রভাবশালী মাতব্বর ও আহমদী নেতা শাহ্ আলমকে শহীদ করতে উদ্যত হয় তা সচেতন ধার্মিকরা জানতে চায়? মোল্লা আমিনুর ও আবদুর রাজ্জাক নামক দুই উগ্রবাদী দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়ার (উত্তর ভবানীপুর) নাসেরাবাদ জামাতে ও রঘুনাথপুর বাগ আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু যথাসময়ে দৃঢ় ও সঠিক পদক্ষেপ নিলে হয়ত রঘুনাথপুর বাগের নৃশংস বর্বরোচিত লোমহর্ষক এ জঘন্য হত্যাকান্ড নিশ্চয় সংঘটিত হতো না। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক যুগান্তর ২রা নভেম্বর ২০০৩ইং সংখ্যায় লিখেছে ঃ যশোরের ঝিকরগাছার রঘুনাথপুর বাগ গ্রামের আহমদীয়া সম্প্রদায়ের স্থানীয় ইমাম মোহাম্মদ শাহ্ আলমকে (৫৫) পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। রিপোর্টসমূহে বলা হয়েছে। এ ঘটনায় আরো দশ জন আহত হয়েছে এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আহমদীয়া জামাত ত্যাগ করতে রাজি না হওয়ায় এক মসজিদের উগ্রপন্থী মৌলবী আমিনুর রহমান - এর নেতৃত্বে আহমদী সম্প্রদায়ের মসজিদে অতর্কিত হামলা চালিয়ে শাহ্ আলমকে হত্যা করা হয় এবং অন্যান্যদের বেদম প্রহার করে। আমিনুর রহমানের নির্দেশে তাঁর জঙ্গীবাদী সঙ্গীরা হকিষ্টিক, লোহার রড, লাঠিসোটা নিয়ে শাহ্ আলমসহ উপস্থিত সকলকে বেধরক মারপিট করে। জানা যায় ইতোপূর্বেও আহমদী জামাতের লোকদের উপর যুলুম নির্যাতন চালানো হয়েছে। মোল্লা আমিনুর রহমান সহ অন্যরা একাধিকবার শাহ্ আলমকে আহমদী জামাত ত্যাগ করার জন্য চাপ দিলেও তিনি তাতে রাজি হন নি। পত্র-পত্রিকান্তরে প্রকাশিত রিপোর্টে আরো বলা হয় গত ৩১ অক্টোবর জুমুআর নামাযের পর উগ্রপন্থী মৌলবাদীরা আহমদী মসজিদে সমানে জড়ো হয়ে আহমদী তরিকা ত্যাগ করার জন্য প্রচন্ডভাবে তাদের চাপ দেয়। এ নিয়ে তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে উগ্রপন্থী মুল্লারা দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আহমদী নিধন অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উগ্রপন্থী ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের লাঠির আঘাতে শাহ্ আলম গুরুতর আহত হয়। তাকে প্রথমে স্থানীয় নাভারন হাসপাতালে ও পরে বিকেলে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার আরো অবনিত হলে রাতে খুলনায় নেয়ার পথে শাহ্ আলমের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় ইউসুফ (৪৫), মতিয়ার (৪২), হাশেম (৭০), আকলিমা (২৮), মনিরুজ্জামান গুরুতর আহত হয়। সুন্নী উগ্রবাদীরা নিহত শাহ্ আলমের বাড়িঘরও ভাংচুর করে। এ লোমহর্ষক হত্যাকান্ডের পর এলাকায় আহমদী মুসলমানরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। সন্ত্রাসবাদকে রুখতে না পারলে আবারও আহমদীরা হামলার শিকার হতে পারে বলে এলাকায় শান্তিকামী মানুষ মনে করেন।

দৈনিক প্রথম আলো ৩রা নভেম্বর ২০০৩ইং সংখ্যায় ঝিকরগাছায় ইমাম খুন। 'দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন' শিরোনামে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে লিখেছে, 'আমরা আরো উদ্বিগ্ন এই খবরটি জেনে যে, কুষ্টিয়ার ভেরামারার উত্তর ভবানীপুর গ্রামে ও স্থানীয় কয়েকটি কাদিয়ানী পুরুষ সদস্যরা সুন্নিপন্থীদের চাপের মুখে ঘরছাড়া হয়েছেন। যারা সেই গ্রামে এখনো আছেন, তেমন ১৪টি কাদিয়ানী পরিবারের সদস্যরা ৯ দিন ধরে গৃহবন্দি জীবন কাটাচ্ছে। এ দু'টি ঘটনা আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর বড়সড় একটি আঘাত বলেই মনে হয়।

বর্তমানে চলছে রমযান মাস। ঝিকরগাছা ও ভেড়ামারার কিছু ব্যক্তি ধর্মের অজুহাতে এ মাসে সংযমের অদ্ভুত নমুনা দেখান। ভিন্ন তরিকার হলেই তার ওপর চড়াও হতে হবে- এমন শিক্ষা এই আক্রমণকারী লোকগুলোকে কে দিল? তারা কি দেশের প্রচলিত আইনকেও তোয়াক্কা করে না? কাদিয়ানী তরিকায় বিশ্বাসীরা এ দেশের নাগরিক এবং এ দেশে পূর্ণ নিরাপত্তায় বসবাসের অধিকার তাদের রয়েছে। ধর্মের নামে তাদের ওপর হামলা ও হানাহানি দেশের প্রচলিত আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইমাম হত্যা এবং কাদিয়ানী হওয়ার কারণে গ্রাম ছাড়া করার মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আমরা চাই, সরকার সকল মত ও পথের মানুষের অধিকার সমুন্নত রাখবে। ইমাম হত্যার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে সরকারকে প্রমাণ করতে হবে যে, ধর্মীয় সম্প্রীতির পথে যে-ই বাধা দিক না কেন তাকে ছাড় দেয়া হবে না।

গত ২রা নভেম্বর রোববার ঢাকায় বকশী বাজারস্থ আহমদীয়া মসজিদ কমপ্লেক্সে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে আহমদীয়া মুসলিম জামাত নেতৃবৃন্দ বলেন, গত কয়েক বছর ধরেই আহমদীয়া জামাতের লোকদের উপর পরিকল্পিতভাবে যে হামলা চালানো হচ্ছে, তারই ধারাবাহিকতায় এ হত্যাকান্ড ঘটানো হয়েছে। বলা হয় ধর্মভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় সদস্য মৌলবী আমিনুর রহমানের নেতৃত্বে এ হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে। (দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ ৩/১১/০৩ইং)। বলা দরকার যে, শাহ্ আলম হত্যা কান্ডের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিচয় যা-ই হোক তারা যে সমাজ - বিরোধী, উগ্রপন্থী সন্ত্রাসী-খুনী ও ধর্মের নামে রক্তপাতকারী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী তা সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহের আলোকেই স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই যে কোন মূল্যে এ অপশক্তিকে প্রতিহত করে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা দরকার।

রঘুনাথপুর বাগের আহমদীয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট শাহ্ আলম দানবীয় অপশক্তির কাছে শির নত করেন নি। ধর্মীয় বিশ্বাস পরিত্যাগের ঘোষণাও দেন নি। বরং সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসে অটল থেকে মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত ছিলেন। স্থানীয় রঘুনাথপুর জামাতের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যেতে পারত নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে

কিন্তু ঐশী খিলাফত ব্যবস্থায় আহমদীয়া নেতৃত্ব সহায়ক পদক্ষেপ নেয়ায় বিপদাবলীর ঝড়ঝঞ্ঝা কাটিয়ে উঠে মাথা উঁচু করে সত্যের পতাকা উর্ধ্বে তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। বর্তমান পতন যুগে এমন ত্যাগের আদর্শ কয়জনইবা স্থাপন করতে পারে? শাহ্ আলম সত্যিকারভাবেই একজন সৎ আদর্শবান যোগ্য সময়ের সাহসী সৈনিক ছিলেন। ইলাহী জামাতে শহীদদের তালিকায় শাহ্ আলমের নামও অন্তর্ভুক্ত হল। শাহ্ আলম এমন এক বিশ্বস্ত আমানতদার নীতিবান গ্রাম্য মাতবর ছিলেন যিনি সর্বদা ন্যায়বিচারের মানদন্ডকে সমুন্নত করে অগ্রসর হয়েছেন। যিনি বয়াত বা দীক্ষা গ্রহণের পর থেকে শাহাদতের পূর্ব পর্যন্ত কখনও আহমদীদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেকে ও তার পরিবার - পরিজনকে দুষ্টচক্রের হামলা থেকে রক্ষা করার চিন্তা করেন নি। এমন ইস্তেকামত প্রদর্শন করা চাট্টিখানি কথা নয়। পবিত্র রযমান মাসে শাহ্ আলমের এ কুরবানী যথার্থই ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর যা ধর্মের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে।

বলা হয় বাংলাদেশ একটি উদার গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এ আধুনিক মুসলিম জন অধ্যুষিত রাষ্ট্রে সর্বতোভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা অপরিহার্য। এদেশের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম করার অধিকার স্বীকৃত রয়েছে। সাংবিধানিক নাগরিক অধিকার লংঘন করা উচিত নয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে সকল নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্ম যার যার, কিন্তু রাষ্ট্র সকলের। ধর্ম নিয়ে মত-পার্থক্য সৃষ্টি হলে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মতপার্থক্য নিরসন করে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। ধর্ম ও রাজনীতির কারণে জাতির মাঝে বিভাজন রেখা যাতে স্পষ্ট হয়ে না উঠে সেই দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা দরকার এবং জাতিগত ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা প্রয়োজন। দেশের জনগোষ্ঠীর মাঝে একতা ও সংহতি ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়লে একটি দেশ খন্ড-বিখন্ড হয়ে যেতে পারে। দেশবাসীর মাঝে বিভাজন রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অঙ্গনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা আবশ্যক। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক শাসককে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ন্যায়বিচারের মানদন্ডকে সমুন্নত করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়। এর অন্যথা হলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা সুকঠিন হবে।

আহমদীয়া মুসলমানরা স্বাধীনভাবে এদেশে যে কোন ধর্ম পালন, গ্রহণ ও বর্জন করার অধিকার রাখে। অন্যের পসন্দনীয় ধর্ম তাদের কাছে ভ্রান্ত বলে পরিগণিত হলে তা তারা গ্রহণ না-ও করতে পারে। আহমদীরা কি তাদের পালনীয় ধর্ম অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে একথা কখনও বলেছে যে, 'তোমরা আহমদীয়া মতবাদ গ্রহণ কর নচেৎ তোমাদের কতল করা হবে।' অথচ আহমদী বৈরী ও বিদ্বেষীরা আহমদীদের পালনীয় ধর্ম ত্যাগ করার জন্যে ক্রমাগতভাবে চাপ দিয়ে আসছে। সুস্পষ্ট করে বলা দরকার যে, আহমদীরা তো ইসলাম ধর্মেই বিশ্বাসী। তারাতো কুরআনী শরীয়তের উপরই আমল করছে। তারা তো কুরআনী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম করছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাকল্পে আহমদীরা হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আগমনকারী ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) হওয়ার দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে সাদরে গ্রহণ বরণ করে নিয়ে ইলাহী জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর অন্যরা যথাসময়ে আবির্ভূত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে মেনে নেন নি। অনাগত সত্যকে মানাটা অন্যায়। নাকি না মানাটা শরীয়ত গর্হিত অন্যায় কাজ, বিষয়টি ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখা উচিত। যারা ঐশী জামাতের বিরোধীতা করছেন তারা কি আল্লাহ্ তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর নির্দেশ লংঘন করছেন না? যারা সমাগত সত্যকে মেনে নেননি তারা নিতান্তই অজ্ঞ। এ কারণে তারা জাহেলিয়ত বা অজ্ঞতার মৃত্যুবরণ করবে। সত্যাশ্রয়ীরা তো ধর্ম পরিবর্তন করতে পারে না। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর আদেশ অমান্য করার ধৃষ্টতা আহমদীরা প্রদর্শন করতে পারে না। ঐশী আদেশ পালন করা ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর নেই।

কুরআন হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর পুর্ণতাকল্পে আখেরী জামানায় (পতন যুগে) যিনি ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন তাকে মান্য করা কি সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যক নয়? কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ছাড়া অন্য কেউ কি যথাসময়ে মাহ্দী ও মসীহ্ হওয়ার দাবী করছেন? তাহলে সত্যদাবী কারককে সাদরে গ্রহণ বরণ নেয়ার পর আর কি মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন উপায় আছে? মহানবী (সঃ)-এর নির্দেশ অমান্যকারীরা সুন্নতওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয় কি করে? তারা কি রসূল করীম (সঃ)-এর আদেশ লংঘন করার পরও নিজেদের সুন্নী বলে পরিচয় দেয়ার অধিকার রাখেন? যারা নবী করীম (সঃ)-এর নির্দেশ পালন করে তাঁর আশীষমন্ডিত আধ্যাত্মিক সন্তান অনুগত শ্রেষ্ঠ উম্মত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে গ্রহণ বরণ করে নিয়েছে তারই তো মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্র রসূল এবং সাহাবা (রাঃ)-গণ যে পথে চলেছেন আহমদীরা তো সে পথেই রয়েছে। কাজেই আল্লাহ্র জামাত ত্যাগ করে অমান্যকারীদের দলে যোগ দেয়া মু'মিন-মুত্তাকীদের জন্যে উচিত হবে কিনা ভেবে দেখা দরকার। কাজেই আমিনুর রহমান ও আবদুর রাজ্জাক এবং তাদের চেলা চামুন্ডাদের হুশ করে কথা বলা দরকার। খোদার উপর খোদাকারী করার সীমাহীন ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের পরিণাম ফল শুভ হয় না।

আল্লাহ্র জামাতে সম্পৃক্ত থাকাটাই আহমদীরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করে থাকে। তাহলে তাদের কি এখতিয়ার রয়েছে ইসলাম ও আহমদীয়ত ত্যাগ করার জন্য চূড়ান্ত নোটিশ দেয়ার। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর নির্দেশ মান্যকারীদের সঙ্গে দুষ্টচক্র যে অন্যায় আচরণ ও যুলুম নির্যাতন করেছে তারা আল্লাহ্র রুদ্র রোষ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারবে কি? রঘুনাথপুর বাগ ও ভেড়ামারার উত্তর ভবানীপুর-এর উগপন্থীদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত করবে কে? ওরা আজ সংখ্যার বলে বলীয়ান হয়ে বল্গাহীনভাবে ধর্মের নামে রক্তপাতের ন্যায় বিভৎস ঘটনার উদ্ভব করেছে। আহমদীদের খুন করছে। পিটাচ্ছে, ঘর-বাড়ী ভাংচুর করছে।

কুরআন মজীদে শহীদদের উচ্চ মাকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ এবং যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে বলো না যে, তারা মৃত; বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারছে না (২ঃ১৫৫)।

এবং যদি তোমরা আল্লাহ্র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ কর তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্র পক্ষ হতে ক্ষমা এবং রহমত তা হতে অনেক উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে (আলে ইমরান ঃ ১৫৮)।

এবং যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে, তাদিগকে তুমি কখনও মৃত্যু মনে করো না। বরং তারা তাদের প্রভুর সন্নিধানে জীবিত, (এবং) তাদেরকে রিযক দেয়া হচ্ছে (আলে ইমরান ঃ ১৭০)।

তারা আল্লাহ্র পক্ষ হতে দেয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহের কারণে আনন্দিত। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মু'মিনগণের পুরস্কারকে কখনও বিনষ্ট করেন না। (আলে ইমরান ঃ ১৭২)।

ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য যারা শহীদ হয়েছেন তারা বড়ই মর্যাদাবান। ইচ্ছে করলেই কেউ শাহাদতের মর্যাদা লাভ করে না। মহান আল্লাহ্ কখন কার শাহাদত কবুল করেন তা তিনিই ভাল জানেন। মহান আল্লাহ্ শাহ্ আলমের শাহাদতকে কবুল করে নিয়েছেন। মাহে রমযানে তার এ কুরবানী বড়ই তাৎপর্যমন্ডিত এবং ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর।

- আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া

যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

(তৃতীয় কিস্তি)

যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য ঃ

ইসলাম টাকা-পয়সা আয় করতে নিষেধ করে নি। অবশ্য টাকা-পয়সা আটকে রাখতে বা খরচ না করতে নিষিদ্ধ করেছে। এরপরও যদি কোন ব্যক্তি নিজের ভবিষ্যত প্রয়োজনের খাতিরে সাবধানতাবশতঃ কিছু অর্থ সঞ্চয় করে আর পড়ে থাকতে থাকতে অনেকটা বছর এভাবে কেটে যায় এ টাকা-পয়সার ওপরে যাকাত প্রদান অবশ্য-কর্তব্য হয়ে যাবে। এর প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন-

খুয মিন আমওয়ালিহিম সাদাক্বাতান তুত্বাহ্‌হিরুহুম তুযাককীহিম অর্থাৎ হে রসূল! এদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করো এভাবেই ওগুলো পাক এবং ওগুলোর পবিত্রতার উপকরণ সৃষ্টি করে দেবে (সূরা আত্‌তাওবা ঃ ১০৩)

যাকাতের ধন-সম্পদ

যাকাতের ধন-সম্পদ দু'প্রকারের হয়ে থাকে। গুপ্ত ধন-সম্পদ ও বাহ্যিক ধন-সম্পদ। গুপ্ত ধন-সম্পদ নগদ অর্থ, সোনা-রূপা যে আাকারেই হোক না কেন, অলংকারাদি হোক বা ব্যবহৃত আরও কোন জিনিস।

(ক) **বাহ্যিক ধন-সম্পদ** ঃ গবাদি পশু। যেমন, উট, গাভী, মইষ, ভেরা, ছাগল জাতীয় পশু। শর্ত এই যে, বাইরে সরকারী চারণ ক্ষেত বা এজমালী গ্রাম্য স্থানে চরে খায় আর এদেরকে বেঁধে রীতিমত খাবার দেয়ার প্রয়োজন হয় না।*

(খ) জমিতে উৎপন্ন ফসলাদি। যেমন, গম, যব, জোয়ার, ধান-চাল, বজরা, খেজুর, আঙ্গুর বনের মধু, যা কেউ সংগ্রহ করেছে। **

(গ) যেসব ধাতব পদার্থ ব্যক্তির নিকট মজুদ আছে যেমন, লোহার খনি, তামার খনি, টিনের খনি, তেলের খনি প্রভৃতি।

(ঘ) ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যবহৃত সম্পদ ঃ শিল্প কারখানার ব্যবহৃত পুঁজি।

(ঙ) বাহ্যিক ধন-সম্পদ থেকে আসলে যাকাত সংগ্রহ করার অধিকার সরকারের। এর কারণে যে, সেসব জমি থেকে সরকার রাজস্ব আদায় করে বা সেসব শিল্প-কারখানার ইনকামট্যাক্স (আয়কর) আরোপ করে এর ওপর অতিরিক্ত যাকাত নেই। কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্র ছাড়া যেখানে সরকারী ট্যাক্স যাকাতের নির্ধারিত হার থেকে কম। এক্ষেত্রে যে পার্থক্য এর হিসেবে নিজ থেকে অথবা সরকারের দাবী অনুযায়ী সানন্দে যাকাত আদায় করা কল্যাণ ও মঙ্গলের কারণ এবং পুণ্যেরও কারণ।

(চ) গুপ্ত ধন-সম্পদের তদারকী সরকারের পক্ষ থেকে হতে পারে না। যেভাবে জমাকৃত নগদ অর্থ মূল্যবান অলংকারাদি বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান পাথর পদ্মরাগ, জমরূদ (এক প্রকারের মূল্যবান সবুজ পাথর)। এসব সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা একজন সত্যিকারের মুসলমানের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। এ যাকাত গরীব মিসকিন অভাবী ব্যক্তিদেরকে স্বয়ং নিজের ইচ্ছায় দিতে পারে আর ধর্মীয় আঞ্জুমান এবং ইশাআত ইসলামের জন্য কেন্দ্রীয় অফিসাদির মাধ্যমেও বন্টন করা যেতে পারে। অধিকতর উত্তম ও প্রত্যেক দিক থেকে কল্যাণকর পদ্ধতি এই যে, এ ধরনের সবটা যাকাত যুগ-খলীফার কাছে পাঠানো হয় যেন গোটা জামাতের গরীব মিসকীন ও অভাবীদের এ সম্পদ থেকে অংশ লাভ হয়। কারণ এটাই যে, উম্মতের সব আলেম এ নিয়মকে স্বীকার করেছেন। যাকাত বন্টন করা যুগ-ইমামের অধিকার (তশরীহে যাকাত, পৃষ্ঠা, ১৩৬)।

যাকাতের আবশ্যক শর্তাবলী ঃ

জমি থেকে উৎপন্ন ফসলাদি যেমন, বিভিন্ন প্রকারের শস্য খেজুর আঙ্গুর, মধু, এদের বেলায় তখন যাকাত অবশ্য-দেয় হয় যখন এগুলো পাকার উপযুক্ত হয় আর এর নিসাব পূর্ণ হয়। এর পরে এ উৎপন্ন দ্রব্য যত বছরই পড়ে থাকুক না কেন এর ওপরে যাকাত প্রবর্তিত হবে না।

অন্য রকমের সম্পদ যেমন নগদ অর্থ, সোনা, রূপা, ব্যবসায়ের মালামাল, গবাদি পশু এগুলোর ওপরে যাকাত তখন অবশ্য-কর্তব্য হবে যখন তা নির্ধারিত নিসাব-এর সমান হয় আর সারা বছর অধীনে থাকে। যত বছর অধীনে থাকবে প্রত্যেক বছর এগুলোর ওপরে যাকাত অবশ্য-দেয় হবে। গবাদি পশুর জন্যে একটি বিশেষ শর্ত এটাও যে, এরা বাইরে সরকারী চারণ ক্ষেত্র, জঙ্গল এবং গ্রাম্য চারণ ক্ষেত্রে চরে আর এর ওপরে তাদের জীবন নির্বাহ হয়, তাদের স্বয়ং খাবার দিতে হয় না। তদুপরি ওগুলো হালে জোতা এবং বোঝা বহনের কাজেও লাগে না।

গবাদি পশুর যাকাত প্রকৃতপক্ষে এমন দেশ ও এলাকার সাথে সম্পর্ক রাখে যেখানে বিস্তীর্ণ চারণ ক্ষেত সহজে পাওয়া যায়। যাদের সাহায্যে সেখানে হাজার হাজার লাখ লাখ ভেড়া-বকরী ও গাভী পাওয়া যায় আর উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন ও দুধ বা মাংস রপ্তানী করা হয়ে থাকে অথবা কোন প্রকারের অন্যান্য ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পেশা হিসেবে পশু পালন করা হয়ে থাকে।

যাকাতের নিসাব ও নিয়মাবলী

নগদ অর্থ, সোনা, রূপা এবং অন্যান্য সব রকমের মূলধনের জন্যে নিসাবের নিরিখ হলো রূপা অর্থাৎ যার নিকট ৫২ তোলা ৬ মাসা অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা থাকে বা এত রূপা বা সোনা থাকে যা দিয়ে এ পরিমাণ রূপা কেনা যায় তখন এর যাকাত দেয়া অবশ্য - কর্তব্য হবে। যাকাতের বিষয় হলো পুরো মূলধনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা আড়াই (২.৫%) শতাংশ। যেমন, ৫২ তোলা ৬ মাসা রূপার মূল্য যদি ১০,৫০০ টাকা হয় আর এত অর্থ তার নিকট থাকে তাহলে ২.৫% হিসেবে নিশ্চিৎ তাকে ১৬২.৫০ টাকা যাকাত দিতে হবে।

এটা সেই সম্পদের যাকাত যার জন্যে নিসাবের নিরিখ রূপা আর নিসাবের নিরিখ জানার জন্যে ওজন হলো মাধ্যম।

মহিলাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারে থাকে এমন সোনা ও রূপার অলংকারাদির বেলায় এবং কখনও কখনও চাওয়ার পরে তারা গরীব স্ত্রীলোকদের ব্যবহার করতে দেয় এর ওপরে

---

* টীকা ঃ ঘোড়া এবং গাধা কি যাকাতের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত বা অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এর যাকাতের শর্ত কী এ প্রশ্নও বিতর্কের বিষয়।

** এ প্রশ্নও উঠে যে, অন্যান্য নগদ অর্থ ও ফসল যেমন, কার্পাশ, তূলা, আখ, তৈলবীজ, রাবার, বিভিন্ন সব্জী,তরমুজ, খরমুজ, বুট, শসা, বিভিন্ন ফল যেমন আপেল, আম, মাল্টা, কিন্নু, কমলা জাতীয় ফল, কলা, বাদাম, আখরোট, পেস্তা, টলগোজা প্রভৃতি এসব উৎপন্ন দ্রব্যের ওপরে যাকাত দিতে হয় কি হয় না এ বিষয়ও দৃষ্টিপটে নিয়ে আসা যায় এবং কিয়াসের নীতির ভিত্তিতে কাজ করে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

যাকাত হবে না। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন, 'যে অলংকার ব্যবহারে রয়েছে এর যাকাত নেই।'

আর রেখে দেয়া হয় এবং কখনও কখনও পরা হয় এর যাকাত দেয়া আবশ্যক। যে অলংকার পরা হয় আর কখনও কখনও দরিদ্র মহিলাদেরকে ব্যবহার করতে দেয়া হয়, কোন কোন লোকের এ ব্যাপারে ফতওয়া এই যে, এর যাকাত নেই। আর যে অলংকার পরা হয় এবং অন্যকে ব্যবহারের জন্যে দেয়া না হয় এর যাকাত দেয়া ভাল। কেননা, এ নিজের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের ঘরে এর ওপরে ও নিজেদের বর্তমান অলংকারের ওপরে যাকাত দেয়া হয় আর যে অলংকার টাকা-পয়সার মত রাখা হয় এর যাকাত দেয়ার প্রসঙ্গে কারও মতভেদ নেই" (মযমুআ ফাতাওয়া আহমদীয়া প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭, আল্ হাকাম, ১৭ নভেম্বর, ১৯০৫)।

ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপরে যাকাত আদায় করার আসল অধিকারী যদিও সরকার আর নিজেদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে তারা ট্যাক্সের পরিমাণও নির্ধারণ করেন। তবুও দিক-নির্দেশনার জন্যে উম্মতের আলেমগণ মূলধনের ওপরে যাকাত নির্ধারণের সে নীতি প্রস্তাব করেছেন এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় অপকার হবে না।

শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগকৃত মূলধন থেকে কেবল সেই মূলধনের ওপরে যাকাত প্রদেয় যা ব্যবসায়ের আবর্তনে রয়েছে অর্থাৎ মালামাল আনতে ও মালামাল বিক্রী করতে ও মালামাল তৈরী করতে হয়। যে পুঁজি বিনিয়োগকৃত কারখানার মেশিনারী, দালান কোঠা, প্রয়োজনীয় অফিসাদি, ফার্নিচার ও হিসাব কিতাবের রেজিষ্টার বই খাতা এবং ফাইল ইত্যাদিতে ব্যয় হয়েছে এর ওপরে যাকাত প্রদেয় হবে না। এভাবে বাস, ট্রাক, টেক্সি ও ভাড়া দেয়ার নিমিত্তে নির্মাণকৃত দোকান-পাট ও ঘর-বাড়ী নির্মাণের ব্যয়কৃত মূলধনও যাকাত থেকে রেয়ায়েত হবে। এমনিভাবে এসব জিনিষ যা মানুষের আসল প্রয়োজন মিটাতে ব্যয় হয় যেমন থাকার বাড়ী, পরার কাপড়-চোপড়, ঘরের আসবাবপত্র, ফার্নিচার, আসা-যাওয়ার গাড়ী, লাইব্রেরীর পুস্তক ইত্যাদি-এর যতই মূল্য হোক না কেন, লক্ষ লক্ষ টাকারই হোকনা কেন এর ওপরেও যাকাত প্রদেয় হবে না।

মোটকথা যাকাত চলমান ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধনের প্রতি। যাকাতের হিসাব এভাবে হতে পারে। যত টাকা যে যে মাসে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হয় তত টাকা সেই সেই মাসে উল্লেখ করে সবটা একত্র করে নেয়া হয় আর ১২ দিয়ে ভাগ করে যে সংখ্যা বের হয় এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দিতে হয়। যেমন, ২৫০.০০ টাকা বছরের প্রথম ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হলো যা বছরের শেষ পর্যন্ত বার মাস ঘটলো। ২ মাস পরে ২০ টাকা আরও বিনিয়োগ করা হলো যা ১০ মাস ব্যবসায়ে ঘাটলো। এর ২ মাস পরে ৫০০.০০ টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হলো যা বছরের শেষ পর্যন্ত ৮ মাস ব্যবসায়ে খাটলো। বছর শেষ হওয়া পর্যন্ত এভাবে হিসাব করা হয় ২৫০.০০ টাকা ১২ মাস, ২০.০০ টাকা ১০ মাস, ৫০০.০০ টাকা, ৮ মাস খাটানো হয়েছে।

এজন্যে	টাকা	মাস	মোট
	২৫০ x	১২	= ৩,০০০/-
	২০ x	১০	= ২০০/-
	৫০০ x	৮	= ৪,০০০/-

			৭,২০০/-

সমস্ত বিনিয়োগকৃত মূলধনের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৭,২০০/= টাকা। একে ১২ দিয়ে ভাগ করলে ৭,২০০/= ÷ ১২= ৬০০/=। এর চল্লিশ ভাগের ১ ভাগ ১৫/= যাকাত ধার্য হবে। (চলবে)

(ফিকাহ্ আহমদীয়া, পৃষ্ঠা ৩৫৮-৩৬২)

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

কবিতা

জাগ্রত বিবেকের কাছে নিবেদন

মান্যবর
শিশুটি আজ কাঁদে কেন বলতে পারেন?
মহাবিশ্বের প্রভুর ঐশী ফরমান-এ সাড়া দিয়ে
এ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে
মেনে ছিল তার পিতা।
শিশুটির চোখের সামনে
নমরুদ, ফেরাউন, আবূ জাহেলের অনুসারী
লেবাসধারী কিছু মোল্লা মৌলবী
নির্মমভাবে হত্যা করেছে তার পিতাকে।

মান্যবর
এরা লোভী, অসত্যভাষী, স্বার্থান্বেষী ভন্ড।
এরা এ যুগের শকুন
লাশের গন্ধ পাবার নেশায়
বিভীষিকাভরা ক্রিয়াপদ আর
ভয়ংকর সব বিশেষণগুলোকে জীবন্ত করে তুলছে
রক্তের নেশায় সমর সাঝে ব্যস্ত
এসব রক্ত পিপাসু দানবরূপী
মানুষগুলোর হিংস্রতার ফসল
৮ অক্টোবর, ১৯৯৯ইং তারিখ
খুলনা আহমদীয়া মসজিদে সাত শহীদের লাশ।
৩১ অক্টোবর, ২০০৩ইং তারিখ, রঘুনাথপুর বাগ
আহমদীয়া মসজিদের ইমাম শাহ্ আলম সাহেব-এর লাশ

মান্যবর
আকাশের নীচে এ ধরণীর বুকে
এরা মেতেছে হিংস্রতা, বীভৎসতা
আর পৈশাচিক রক্ত নেশার উল্লাসে
শান্তির গলায় এরা পরিয়েছে ফাঁস।
নিরপরাধের শবগুলো দেখে এরা
কুকুর শকুনের মত করে উল্লাস।

মান্যবর
এ পৃথিবীর আকাশের নীচে আজ
এ কেমন নির্মম মানবিক মৃত্যুর তুহীন স্তব্ধতা?
স্বজন হারাদের চোখে আজ
বাষ্প-কণার মতো কুয়াশা।
দিগন্তের হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে
স্বামী হারানো বিধবা মায়ের আকুল আর্তনাদ।
সমুদ্রের বাধাহীন ঢেউয়ের মতো
পিতা হারানো সন্তানের দিকে দিকে প্লাবিত কান্না।

মান্যবর
নাশ করো এ জাতি-বিদ্বেষ
মূল ধরে টেনে তোলো
সাম্প্রদায়িকতার বীজগুলোকে।
আগুনে পুড়িয়ে দাও
মূলসহ ডাল পাতাগুলোকে
নয়তো একদিন এটি, পুড়িয়ে ছাই করবে
এ সুন্দর ধরণীকে॥

- নাসের আহমদ আনসারী

এসো কুরআন শিখি

(১০ম কিস্তি)

আয়াত নং ৭০ ঃ

শব্দার্থ ঃ ক্বালূ- তারা বললো, **উদ'উলানা রব্বাকা** - তুমি আমাদের জন্যে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নিকট দোয়া কর, **ইউবায়্যিলনা** - তিনি যেন স্পষ্টভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দেন, **মা লাওনুহা** - ওটার রং কী? **ক্বালা** - তিনি বল্লেন, **ইন্নাহূ** - নিশ্চয় এটা, **ইয়াকূলু** - তিনি বলছেন, **ইন্নাহা বাকারাতুন** - নিশ্চয় এটা একটি গাভী, **সাফরা-উ-তা** একটি হলুদ রং-এর গাভী, **ফা-ক্বিউল্লাওনুহা** - রং উজ্জ্বল গাঢ়, **তাসুররুন্নাযিরীন** - দর্শকদেরকে আনন্দ দান করে।

অনুবাদ ঃ তারা বললো, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নিকট দোয়া কর যেন তিনি আমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, ওটার রং কী? সে বললো, 'নিশ্চয় তিনি বলেছেন, তা একটি হলুদ রং-এর গাভী, যার রং উজ্জ্বল গাঢ়। এ দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।

আয়াত নং ৭১ ঃ

শব্দার্থ ঃ ক্বালূ- তারা বললো, **উদ'উলানা, রব্বাকা** - তুমি আমাদের জন্যে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নিকট দোয়া কর, **ইউবায়্যিল্লানা মা হিয়া** - তিনি যেন পরিষ্কারভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দেন, তা কেমন? **ইন্নাল বাকারা** - নিশ্চয় সব গাভী, **তাশা-বাহা 'আলায়না** - আমাদের নিকট একই রকম মনে হচ্ছে, **ওয়া ইন্না** - আর নিশ্চয়, **ইনশা-য়া-আল্লাহু** - আল্লাহ্ চাইলে, **লা মুহ্তাদূন** - অবশ্যই আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবো।

অনুবাদ ঃ তারা বললো, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নিকট দোয়া কর তিনি যেন আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, তা কেমন? নিশ্চয় আমাদের নিকট সব গাভী একই রকম মনে হচ্ছে, আর আল্লাহ্ চাইলে নিশ্চয় আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হব।'

আয়াত নং ৭২ ঃ

শব্দার্থ ঃ ক্বালা- সে বললো, **ইন্নাহূ ইয়াকূলু** - নিশ্চয় তিনি বলছেন, **ইন্নাহা বাকারাতুন** - অবশ্যই এ এমন এক গাভী, **লা যালূলু তুসীরুল আরযা** - জমি চাষ করতে হালে জোতা হয় নি, **ওয়ালা তাসক্বিল হারসা** - এবং ক্ষেতে পানি সেচের কাজও করে না, **মুসাল্লামাতুন** - সুস্থ নিখুঁত, **লা শিয়াতা ফীহা** - এতে কোন দান নেই, **ক্বালূ** - তারা বললো, **আল্ য়া-না জিতা বিল হাক্কি** - তুমি এখন প্রকৃত বিষয় তুলে ধরেছো, **ফাজাবাহূহা** - তখন তারা একে জবাই করলো, **ওয়া কাদূ** - যদিও তারা প্রস্তুত ছিল না, **ইয়াফ'আলূন** - তা করতে।

অনুবাদ ঃ সে বললো, নিশ্চয় তিনি বলেছেন, অবশ্যই এ এমন এক গাভী যা জমি চাষ করতে হালে জোতা হয় নি এবং ক্ষেতে পানি সেচের কাজও করে না, তা সুস্থ নিখুঁত যাতে কোন দাগ নেই।' তারা বললো, 'তুমি এখন প্রকৃত বিষয় তুলে ধরেছো।' তখন তারা একে জবাই করলো যদিও তারা তা করতে প্রস্তুত ছিলো না। *৮ রুকূ*

আয়াত নং ৭৩ ঃ

শব্দার্থ ঃ ওয়া ইয্ ক্বতালতুম - এবং যখন তোমরা হত্যা করেছিলে, **নাফসান** - এক ব্যক্তিকে, **ফাদ্দারা'তুম ফীহা** - আবার তোমরা সে সম্বন্ধে মতভেদ করছিলে, **ওয়াল্লাহু মুখরিজুন** - অথচ আল্লাহ্ প্রকাশকারী, **মা-কুনতুম তাকতুমূন** - যা তোমরা গোপন করেছিলে।

অনুবাদ ঃ এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে আবার তোমরা সে সম্বন্ধে মতভেদ করছিলে, অথচ তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ্-এর প্রকাশকারী।

আয়াত নং ৭৪ ঃ

শব্দার্থ ঃ ফাক্বুলনা - অতএব আমরা বললাম, **ইযরিবূহু** - একে মিলিয়ে দেখ, **বিবা'যিহা**- অপরের সাথে, **কাযা-লিকা** - এভাবেই, **ইউহিল্লাহুল মাওতা** - আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন, **ওয়া ইউরিকুম আ-য়া-তিহী** - এবং তোমাদেরকে নিজ আয়াত দেখান, **লায়াল্লাকুম তা'ক্বিলূন** - যেন তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাও।

অনুবাদ ঃ অতএব আমরা বললাম, 'এ ঘটনাকে অপরটির সাথে মিলিয়ে দেখ' (তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে)। এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে নিজ নিদর্শনাবলী দেখান যেন তোমরা বুদ্ধি খাটাও।

আয়াত নং ৭৫ ঃ

শব্দার্থ ঃ সুম্মা ক্বসাত - তথাপি কঠিন হয়ে গেল, **কুলূবুকুম** - তোমাদের অন্তর, **মিমবা'দি** - এরপর, **যা-লিকা ফাহিয়া কাল্ হিজারাহ্** - তা যেন পাথরের মত, **আও আশাদ্দু ক্বসওয়াতান** - কিংবা এর চেয়েও অধিক কঠিন ছিল, **ওয়া ইন্না মিনাল হিজারাতি** - অথচ নিশ্চয় এক ধরনের পাথর আছে, **লামা ইয়া-তাফাজ্জারু মিনহুল আনহার** - যা থেকে নদ-নদী বয়ে যায়, **ওয়া ইন্না মিনহা** - এবং নিশ্চয় এদের মাঝে কিছু, **লামা ইয়াশ্শাক্ক্বাকু** - এমনও আছে যা ফেটে যায়, **ফাইয়াখরুজু মিনহু** - তখন তাথেকে বের হয়, **আল্ মা-উ** - পানি, **ওয়া ইন্না মিনহা** - এবং নিশ্চয় এদের মাঝে কিছু, **লামা ইয়াহ্বিতু** - এমনও আছে যা নত হয়ে পড়ে, **মিন খশইয়াতিল্লাহ্** - আল্লাহ্র ভয়ে, **ওয়ামাল্লাহু** - আর আল্লাহ্ নন, **বিগাফিলীন** - অনবহিত, **আম্মা তা'মালূন** - তোমরা যা-ই কর সে সম্বন্ধে।

অনুবাদ ঃ তথাপি তোমাদের হৃদয় এর পর কঠিন হয়ে গেল তা যেন পাথরের ন্যায় কিংবা এর চেয়েও অধিক কঠিন ছিল, অথচ নিশ্চয় এক ধরনের পাথর আছে যা থেকে নদ-নদী বয়ে যায় এবং নিশ্চয় এদের মাঝে এমনও আছে যা ফেটে গিয়ে তাথেকে পানি বেরিয়ে আসে। আর নিশ্চয় এদের মাঝে কিছু এমনও আছে যা আল্লাহ্র ভয়ে নত হয়ে পড়ে। আর তোমরা যা-ই কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

আয়াত নং ৭৬ ঃ

শব্দার্থ ঃ আফাতাত্বমাউনা - তোমরা কি আশা কর? **আঁইউমিনূলাকুম** - তারা তোমাদের কথা বিশ্বাস করবে, **ওয়া ক্বাদ কা-না ফারীক্বুম্মিনহুম** - সেক্ষেত্রে তাদের মাঝে অবশ্যই এখনও একদল আছে, **ইয়াসমা'উন** - শুনে, **কালামাল্লাহি** - আল্লাহ্র কালাম, **সুম্মা ইউহাররিফূনাহূ** - আবার একে বিকৃত করে দেয়, **মিমবা'দি** - এরপরে, **মা আক্বালুহু** - তারা তা ভালভাবে বুঝবার পর, **ওয়াহুম ইয়া'লামূন** - এমতাবস্থায় যে তারা জানে, বা জেনে-শুনে।

অনুবাদ ঃ তোমরা কি আশা কর তারা তোমাদের কথা বিশ্বাস করবে সেক্ষেত্রে তাদের মাঝে অবশ্যই এমনও একদল আছে, যারা আল্লাহ্র বাণী শোনে আবার তা ভালভাবে বুঝাবার পরও একে জেনে-শুনে বিকৃত করে দেয়? (চলবে)

সংকলন - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

ওয়াযকুরূ মোহাসিনা মাওতাকুম বিল খায়ের

হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রাঃ)-এর দানশীলতা

[সীরাতে হযরত মির্যা শরীফ আহমদ - থেকে সংকলিত]

১। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) এম, এ, বর্ণনা করেন- মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের জীবনে স্বচ্ছলতা আর অভাবের অনেক সময় এসেছে এবং প্রত্যেক সময়ে তিনি নিজ রাজকীয় চাল-চলন বজায় রেখেছেন। তিনি মনের দিক দিয়ে দরবেশ ছিলেন কিন্তু মেজাযে বাদশাহ্ ছিলেন। স্বচ্ছলতার সময়ের কথা আর কি বলব, অভাবের সময়ও তিনি রাজকীয় মেজায প্রতিষ্ঠিত রাখতেন এবং সমস্যার দিগুলোতে কার্পণ্য করতেন। গরীবদের সাহায্য করতে বড় দয়ার্দ্রচিত্তে অংশ নিতেন। অনেক সময় এমন হয়েছে, রাস্তায় চলার সময় কোন গরীব ব্যক্তিকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে পকেট থেকে একশ' টাকার নোট বের করে সেই ব্যক্তির হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। সেই ব্যক্তি অবাক হয়ে চোখ পিটপিট করছে আর এ দরবেশ নীরবে সামনে চলে গেছেন। নিজের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ না করার ফলে তিনি অনেক সময় ধার করতেন কিন্তু তাঁর রাজকীয় খরচের কখনও পার্থক্য হয় নি। সারাজীবন এ রাজকীয় খরচের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাই হয়ত তাঁর জন্মের সময় খোদার ফিরিশ্‌তা আকাশে তাঁর ভবিষ্যত জীবনের অবস্থা দেখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কানে খোদার কথা পৌঁছে দিয়েছিলেন "সেই বাদশাহ্ আসছেন (উত্ত বাদশাহ্ আতা হ্যায়)"।

২। হযরত নওয়াব মোবারকা বেগম সাহেবা বর্ণনা করেন- নাম শরীফ, মন শরীফ (অভিজাত), সম্পর্কগুলো আযীযানা শরীফানা (আন্তরিক ও গভীর), হৃদয় পরিষ্কার সহমর্মী। আবার সবার দুঃসময়ের বন্ধু। নিজ সাধ্যের চেয়ে বেশি গরীবদের সাহায্যকারী। যাকে দেখে অভাবগ্রস্থ মনে হয়েছে পকেট ঝেড়ে দান করেছেন। নিজে ঋণ করে প্রায়ই অভাবে পতিত গরীবদের ঋণ শোধ করেছেন। আসলে বাদশাহী হৃদয় নিয়ে জন্ম নিয়েছিলেন কিন্তু নিজ জীবন সাদাসিদেভাবে জীবন-যাপন করেছেন। কাপড় ফেঁটে যেত, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করতেন না, যেমনই হোক পরে নিতেন।

৩। চৌধুরী সাঈদ আহমদ আলমগীর সাহেব বর্ণনা করেন, একদিন কোন কাজের জন্য মিঁয়া সাহেব (হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব) তাঁকে অফিসে ডেকে পাঠান এবং বিভিন্ন কাজের দিক-নির্দেশনা দেন। ইতোমধ্যে একজন সুপরিচিত হাফেয সাহেব কোন রুটিন-ভিত্তিক কাজের কারণে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অফিসে আসলে তিনি দাঁড়িয়ে তাকে নিজের নিকটে বসালেন এবং কুরআনের তেলাওয়াত শোনার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন। যখন তিনি (হাফেয সাহেব) কুরআন তেলাওয়াত শেষ করলেন তখন হযরত মিঁয়া সাহেব বিদায় দেয়ার সময় চুপিচুপি দশ টাকার নোট তাঁর হাতে দিয়ে দিলেন।

৪। হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন- আমি 'পারসিন ম্যানুফ্যাকচারিং-এ কাজ করতাম। আমার ড্রাইভারের নাম ছিল ফযল দীন। সে একদিন একটি চিরকুট কোষাধ্যক্ষের কাছে নিয়ে আসল এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়মানুসারে সেই চিরকুট স্বাক্ষরিত করতে আমার কাছে নিয়ে আসল। এই চিরকুটে হযরত মিঁয়া সাহেব (হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব) লিখে দিয়েছিলেন, এ ব্যক্তিকে একশ' টাকা দিয়ে দেয়া হোক। আমি মিঁয়া ফযল দিনকে বললাম, 'তুমি কি মিঁয়া সাহেবের কাছ থেকে কিছু চেয়েছিলে?" সে বলল- না, আমি বাজারে যাচ্ছিলাম আর তিনি (হযরত মিঁয়া সাহেব) গাড়ীতে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, আমার সাথে অফিসে আসো। আমি গেলে তিনি একটি খাম দিয়ে বললেন, কাল ছুটি, পরশু অফিসে নিয়ে যেও।

৫। সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন- দেশ বিভাগের পর প্রথমদিকে আমরা মডেল টাউনে থাকতাম। মডেল টাউনে এক পান বিক্রেতা ছিল। তাঁর দোকান বড় সড়কের কিনারায় ছিল। আমিও মাঝে মাঝে এখান থেকে পান নিতাম। সে একদিন আমাকে বলল, 'সেই বুযুর্গ (মনীষী) যাঁর কারখানা আছে তিনি আপনার কে?'

হয়ত আমার চেহারা দেখে অথবা কখনও তাঁর সাথে দেখে সে আন্দাজ করেছে। আমি বললাম, কেন, কী ব্যাপার। সে বলল, 'একদিন তিনি দোকানে এসেছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন- অবস্থা কী রকম?' আমি বললাম, 'বিক্রির বাজার মন্দা'। তিনি পকেট থেকে একশ' টাকার নোট বের করে আমাকে ধরিয়ে বাইরে রওয়ানা হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে টাকা ফেরত দেব,' তিনি বললেন, 'ফেরত নেয়ার জন্য দিয়েছি কবে?'

৬। হযরত হযরত মৌলানা আবুল আতা সাহেব বর্ণনা করেন- (হযরত মিঁয়া সাহেব) কোন কোন নতুন দোকানদারদের শুধু মাত্র সাহায্যের জন্য দোকানে গিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জিনিস কিনতেন যাতে তাদের সাহায্যও করা হয় আর সম্মানও বজায় থাকে।

৭। মোকাররম নায়েক মোহাম্মদ খান সাহেব বলেন, তিনি মিলিটারীতে এক বার্মীজ কোম্পানীতে ছিলেন। বর্মীরা খুব ফালতু খরচ করত। তারা পুরো বেতন খরচ করে হযরত মিঁয়া সাহেবের কাছে লাইন লাগাতো। তিনি আমাকে আদেশ দিতেন একে বিশ টাকা দাও, ওকে চল্লিশ টাকা দিয়ে দাও। অনেক সময় কোন ব্যক্তিকে তিনি ১৮০ টাকা পর্যন্তও দিয়েছেন।

নায়েক মোহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করেন- একদিন আমি বল্‌লাম, হযরত মিঁয়া সাহেব, আমার কাছে কোন টাকা নেই। একথা শুনে তিনি আমাকে গোলাম নবী সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "এ যত টাকা চাইবে আমার হিসাব থেকে দিয়ে দেবেন।" এরপর যখনই কোন ব্যক্তিকে তিনি আমার কাছে পাঠাতেন, আমার কাছে টাকা না থাকলেও বলতাম, অমুক সময় এসে নিয়ে যেও। আর আমি ওখান থেকে টাকা এনে দিয়ে দিতাম। তিনি ডাক ঘরের লোকদের বলে দিয়েছিলেন, "আমার সমস্ত মনি অর্ডার, বীমা ইত্যাদি নায়েক মোহাম্মদ সাহেবকে দিয়ে দেবেন।"

নায়েক মোহাম্মদ খান সাহেব বলেন, মুরাদ খান সাহেবের নিকট হতে আমি কাজ শিখেছিলাম। তিনি বলতেন, 'আমি জীবনে এত উদার কোন ব্যক্তিকে দেখি নি।' একবার তিনি অফিসারদের দাওয়াত করেছিলেন (তিনি প্রতি মাসে একবার অবশ্যই এমন দাওয়াত করতেন), তো অনেক পোলাও থেকে গেল। আমি অন্য কোম্পানীতে পাঠানদেরকে পোলাওয়ের প্লেট পাঠিয়ে দিলাম। পাঠানদের রীতি অনুসারে তারা সেই প্লেট ভর্তি করে মিষ্টি পাঠিয়ে দিল। হযরত মিঁয়া সাহেব যখন জানতে পারলেন তো বললেন, "চালের চেয়ে বেশি দামের মিষ্টি দিয়েছে, বেচারাদেরকে কোন অজু হাতে কিছু টাকা দিয়ে দিও।" তাই পরে আমি তাদের কিছু টাকা দিয়ে আসলাম।

৮। চৌধুরী সাঈদ আহমদ আলমগীর সাহেব বর্ণনা করেন- হযরত মিঁয়া সাহেব কয়েকজন শিশুকে স্কুলের বই কিনে দিতেন আর বলতেন

এটা আল্লাহ্‌তাআলার ভালবাসাকে উদ্দীপ্ত করার একটা উপায়।

৯। চৌধুরী যহুর আহমদ এডিটর সাহেব বর্ণনা করেছেন- কাদিয়ানে যখন বৃষ্টি হতো এবং প্রবল বাতাস বইতো যেহেতু বসতি ফাঁক ফাঁক ছিল তাই কোন কোন ঘরের দেয়াল পড়ে যেতো। তিনি প্রত্যেক বৃষ্টি এবং ঝড়ের পরে বাইরে বেরোতেন এবং লোকদের দেয়াল তোলার ব্যাপারে উপদেশ দিতেন আর কোন কোন গরীবকে লুকিয়ে সাহায্যও দিতেন। একবার প্রচন্ড বৃষ্টিতে আমাদের সাহায্যকারী কর্মচারীর ঘর পড়ে গেল। সে অফিসে এলো এবং আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গেল। হযরত মিঁয়া সাহেব আসলেন আর তার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, তার ঘর পড়ে গিয়েছে তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। পরদিন সেই কর্মচারী যখন আসল তখন তাকে পরামর্শ দিলেন এখন এমনভাবে ঘর তৈরী করবে, এসব উপকরণ ব্যবহার করবে। সে বলল, "আমি দুই বছরের বেতন দিয়েও তো এমন ঘর তৈরী করতে পারব না।" তখন তিনি আমাকে ডেকে যত টাকা প্রয়োজন ছিল তা দিয়ে দিতে বললেন।

১০। চৌধুরী সাঈদ আহমদ আলমগীর সাহেব, সাবেক কোষাধ্যক্ষ বর্ণনা করেন, দায়িত্ব পালন করার কারণে প্রায়ই মিঁয়া সাহেবের সাথে টাকা - পয়সা লেনদেন করার প্রয়োজন হতো। আমি অন্যান্যদের কাছ থেকে তাঁর যে গরীব পালনের এবং বন্ধুত্বের ঘটনাবলী শুনেছিলাম, আমি তাঁকে এর চেয়েও বেশি উদার পেয়েছি। অভাবী লোকেরা এবং ঋণগ্রস্তরা প্রায়ই তাঁর কাছে সাহায্যের আশায় আসতো আর কখনই খালি হাতে ফেরৎ যেতো না। কয়েকবার আমি দেখেছি প্রার্থীকে তিনি চাহিদার পরিমাণ থেকে বেশি দিয়েছেন। আর অনেক সময় ধার নিয়ে সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করেছেন। লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে তো ধার নেয়ই কিন্তু কেউই অন্যের প্রয়োজনে ধার নেয় না।

১১। চৌধুরী যহুর আহমদ বাজওয়া সাহেব বর্ণনা করেন- অনেক সময় মিসকীনরা যদি কোনভাবে জানতে পারত যে, আজ হযরত মিঁয়া সাহেবের কাছে টাকা আছে তো হাজির হয়ে যেত। এ সময় তিনি দরজাতেই থাকতেন তো সাহায্য দিয়ে দিতেন। কখনও যদি পকেটে টাকা না থাকত তো ধার করে প্রার্থীর প্রয়োজন পূর্ণ করতেন।

১২। মোকাররম নায়েক মোহাম্মদ খান সাহেব বর্ণনা করেন- একদিন (হযরত মিঁয়া সাহেব) কারখানায় আসলেন তো মিস্ত্রী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল অফিসে আস নি কেন ? মিস্ত্রী বলল, "হুযূর স্ত্রী অসুস্থ ছিল।' তাই বললেন, 'এরপর?' সে বলল, 'ডাক্তার বলেছে অমৃতসর নিয়ে যেতে।' তিনি কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, "একে একশ' টাকা দিয়ে দাও।"

১৩। নায়েক মোহাম্মদ খান সাহেব বলেন- আমি সফরেও দেখেছি কোন ব্যক্তি এসে চাইত, তিনি পকেটে হাত দিয়ে যা হাতে আসত দিয়ে দিতেন।

১৪। তাঁর কীর্তিকলাপের একটি অবস্থা সৈয়্যদ মোবারক সাহেব, পিতা মৌলানা সৈয়দ সরওয়ার শাহ্ সাহেব, বর্ণনা করেন- হযরত মিঁয়া সাহেব এভাবে কোন কোন লোককে সাহায্য করতেন যে, দ্বিতীয় কেউ জানতে পারত না। তিনি এক বিধবা মহিলাকে এমন সাহায্য করতেন যে, আমি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি তা জানতে পারত না। তিনি একে ২৫ টাকা মাসিক সাহায্য দিতেন। আমাকে - সাঈদ আহমদ কোষাধ্যক্ষ সাহেব তাঁর বৈশিষ্ট্যের ঘটনাবলী শুনিয়েছেন যে, হযরত মিঁয়া সাহেব শুধু নিজের কর্মচারীর নয় বরং আঞ্জুমানের সকল কর্মচারীর প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং তাদের দুঃখের সাথী হতেন। আসলে তিনি একজন সহানুভূতিশীল, নরম হৃদয়ের এবং সহমর্মী দয়ালু অফিসার ছিলেন। তিনি নিজ সেবক এবং কর্মচারী ও পরিচিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনের খুব খেয়াল রাখতেন।

১৫। চৌধুরী সাঈদ আহমদ আলমগীর সাহেব বর্ণনা করেন- হযরত মিঁয়া সাহেব আমাকেও আর আমার দপ্তরের কর্মচারীদের সব সময় দোয়া করার উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, দোয়া ব্যতীত আল্লাহ্‌তাআলার সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। সিলসিলাহ্‌র কয়েকজন বুযুর্গকে তিনি নিজেও দোয়ার আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখতেন আর সাথে নজরানা বা উপহার হিসেবে অবশ্যই কিছু নগদ টাকা বা জিনিস পাঠাতেন।

১৬। হযরত মিঁয়া সাহেব পায়ে হাঁটায় অভ্যস্ত ছিলেন। কখনও অভাবী কোন পথিকের সাথে পথে দেখা হতো তো একে লক্ষ্যে পৌঁছার ভাড়া দিয়ে দিতেন। সন্ধ্যায় যদি কোন মুসাফিরের সাথে দেখা হতো তো নিজে তাকে মেহমান খানায় নিয়ে এসে তার থাকার ব্যবস্থা করতেন আর যদি সেই ব্যক্তির কাপড় ময়লা হতো তো তাকে সাবান কেনার জন্য কিছু টাকা দিয়ে দিতেন। যদি কোন কৃষক গম নেয়ার জন্য তাঁর ঘরে আসত তো তাকে কমপক্ষে একমন গম কেনার টাকা দিয়ে দিতেন আর আমাকে বলে দিতেন এ'র নামে ধার লিখবে না।

১৭। হযরত মিঁয়া সাহেবের গরীব পালন আর তাওয়াক্কুল 'আলাল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র উপর ভরসা - এর খুব উঁচু দরজার ছিল। যুদ্ধের সময়ে আল্লাহ্‌তাআলা অসাধারণভাবে হযরত মিঁয়া সাহেবকে আমীরের পদ দিলেন আর দেশ বিভাগের পর সমস্যাও এলো। কিন্তু দুই অবস্থাতেই হযরত মিঁয়া সাহেবের ব্যবহার এক রকম রইল। যখন পকেটে হাজার টাকা থাকত তখনও আবার যখন পকেট খালি থাকত তখন অভাবগ্রস্তদের জেরা করে করে খোঁজ নিতেন আর নিজ প্রয়োজনকে স্থগিত রেখে পকেট খালি করে দিতেন।

১৮। কাদিয়ানে (হযরত মিঁয়া সাহেব) ডাক্তার আহসান আলী সাহেবের দোকানে প্রায়ই যেতেন। আসল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কোন বন্ধুকে সাহায্য করা, টাকার অভাবে যে চিকিৎসা করাতে পারে না। ডাক্তার আহসান আলী সাহেব বলেন- এমন দুয়েকজন নয় বরং বিশজন লোক ছিল যাদের হযরত মিঁয়া সাহেব নিজ খরচে সম্পূর্ণ চিকিৎসা করিয়েছেন। লোকদের আরামের জন্য দোকানের ছাদে ফ্যান লাগিয়ে দিয়েছেন।

১৯। মালেক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব লিখেন -

১৯৫৪ সালে খাকসার দৈনিক আল্ ফযলের ম্যানেজার ছিলাম। সে সময় আল্ ফযলের অফিস কায়েদে আযম সড়ক সংলগ্ন ম্যাকলেগণ রোডে অবস্থিত ছিল। কখনও কখনও (হযরত মিঁয়া সাহেব) এখানে আসতেন আর খাকসারকে নিয়ে আনারকলিতে যেতেন। একবার আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম, হাঁটতে হাঁটতে শহরতলীতে লাহোরী দরজা পর্যন্ত এলাম। এখানে সবসময় ফল বিক্রেতারা বসে। তাঁর নির্দেশমত এখান থেকে আঙ্গুর কিনলাম আর আনারকলি এসে লাহোর আর্ট প্রেসের বিপরীতে অবস্থিত রয়েল হোটেলে আসলাম। সেখান এক সেবক, যে তাঁর পরিচিত মনে হচ্ছিল, দৌড়ে এলো। বিনীত সালাম করে জিজ্ঞেস করল, 'কি আদেশ?" তিনি বললেন, "এই আঙ্গুর খুব ভাল করে ধুয়ে আনো আর সাথে দুই পাত্র চা এনো।" এরপর তিনি বাথরুমে চলে গেলেন আর ফেরত আসার আগেই সেবক হুকুম পালন করে এল। নিশ্চয় তিনি অল্প কিছু আঙ্গুর খেলেন আর বাকিটা সেবককে দিয়ে দিলেন। আমায় বললেন, একে দুই টাকা পুরস্কার দিয়ে দিন। এই বলে তিনি হোটেলের বাইরে গেলেন। আমি পয়সা দেয়ার সময় সে বলছিল, "সাহেব বড় সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক মনে হয়। রাজকীয় ব্যবহার। যখনই আসেন খাকসারকে পুরস্কারে ভুষিত করেন।"

[দৈনিক আলফযল, ১০ মার্চ, ২০০৩ সংখ্যা থেকে]

অনুবাদ - **লুৎফুর রহমান তাহের**

প্রকৃত মুসলমান কে বা কারা?

বর্তমান সমাজের মাঝে আমরা যে নানান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি এর মাঝে ধর্ম নিয়ে যে সমস্যা তা সবচেয়ে বড় বলে মনে হয়। যেখানে খোদাতাআলা বলছেন, "ধর্ম সহজ" কিন্তু বর্তমান সমাজে ধর্মকে এত কঠিনরূপে প্রকাশ করা হচ্ছে, বুঝতে পারছি না এত কঠিন করার পেছনে কোন যুক্তি মাথা ঘামাচ্ছে। আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি, সকল ধর্মের প্রচার কার্যের মাঝে স্বাধীনতার বড় অভাব। বর্তমানে কেন ধর্ম নিয়ে এত মারামারি, কাটা-কাটি, মসজিদ পুড়ানো, পবিত্র কুরআন পুড়ানো, নামাযরত অবস্থায় মুসল্লিকে হত্যা করা, মসজিদের ইমামকে জীবনের জন্য পঙ্গু করে দেয়া, বা খতম করে দেয়া, নিরীহ মুসলমানকে অত্যাচার করা ইত্যাদি সমাজে অবিরল চলছে। কে প্রকৃত মুসলমান আর কে অমুসলমান এ নিয়ে সমাজে সর্বত্র চলছে কলহ- বিবাদ। ইসলাম তো এ শিক্ষা দেয় না যে, ধর্মের নাম নিয়ে সমাজে নানা ধরনের অপকর্ম চালিয়ে যাও আর মারামারি, খুন-খারাপি করো। এটা কি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা? বরং ইসলামের শিক্ষা হলো যার যার ধর্ম-কর্ম নিজ নিজ মতে নিজ নিয়মে পালন করতে পারবে এবং স্বাধীনভাবে যার যার ধর্ম প্রচার করতে পারবে। আমরা যদি ইসলামের গোড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখা যাবে, ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য কত উচ্চ মার্গের ছিল! সে যুগে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বিধর্মীদের সাথে চুক্তি করছেন। তার মাঝে প্রথমে রাখছেন ধর্ম নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করা যাবে না। সবাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। যেমন ভাবে সূরা 'আল্ কাফিরূনে' বর্ণিত হয়েছে, "তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য আর আমাদের ধর্ম আমাদের জন্য।" আবার সুরা বাকারা'র ২৫৭নং আয়াতে মহান খোদাতাআলা বলছেন "ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই।" কিন্তু আজ আমরা যদি ইসলামের দিকে তাকাই তা হলে দেখতে পাই, উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াত ও রসূল করীম (সঃ)-এর কথার উপর আমল না করে সমাজে চলছে তার উল্টোটা। আজ মনে হয় ইসলাম বিভিন্ন ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ধর্ম ব্যবসায়ীরা ইসলামী নাম নিয়ে যা খুশী তা করে যাচ্ছে। আজ তারা ধর্মের নাম নিয়ে মানুষ হত্যা করছে আর বলছে আমরা ইসলামের পক্ষে জেহাদ করছি। ধর্মকে বানিয়েছে ব্যবসায়ের বস্তু। যে কোন বিষয়ে ফতওয়া দিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। জানাযার নামাযে পয়সা নিচ্ছে। কুরআন খতমে পয়সা, মিলাদ মাহফিলে পয়সা, কুরবানীর পশু জবাই তাতেও পয়সা, মনে হয় ধর্মে অর্থ ছাড়া কিছুই নেই। এ সব ধর্ম ব্যবসায়ীরা ইসলামের ভিতর নতুন নতুন আইন-কানুন গড়ে তুলে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্যকে নষ্টের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ইসলামের বিজয় কিছুটা বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে। আজ আমরা দেখতে পাই সমাজের একদল আরেক দলকে কাফির আখ্যা দিয়ে রেখেছে। জরিপ করে যদি দেখি তা হলে মনে হয় এমন কোন ফের্কা বা সম্প্রদায় নেই যারা কাফির ফতোয়ায় সামিল নয়। এক দলের নেতা বলে আমরা একমাত্র প্রকৃত ইসলামের অনুসারী। আরেকদল বলে আমরাই প্রকৃত মুসলমান। এভাবে দেখা যায়, এক দল অপর দলের সাথে লেগেই আছে। সবাই যদি বলে আমরা সত্য অন্যরা মিথ্যা, নিজ নিজ স্থানে সবাই সত্য বলে দাবি করে তাহলে প্রকৃত সত্য কে? চিন্তা করুন নিজ দলকে সত্য বানিয়ে অন্য দলকে কাফির আখ্যা দিয়ে কত গর্ববোধ করছে আজকের নামধারী আলেমরা। আজকাল ফতওয়ার খুব ছড়াছড়ি। কথায় কথায় ফতওয়া। একথা সবাই জানেন। একদল ধর্ম ব্যবসায়ী আলেম সবসময় প্রগতির বিরুদ্ধে ফতওয়া প্রদানে সোচ্চার। তারা এ প্রচার চালাত যে, ইংরেজী শিখলে কাফির হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনকে ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করলে মহাপাতকী হতে হবে। এ ফতওয়া কারো অজানা নয়। শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মোহাদ্দেস দেহলবী সর্বপ্রথম ফারসীতে কুরআন অনুবাদে করে তৎকালীন মোল্লা সম্প্রদায় কর্তৃক কুফুরী ফতওয়ায় ভূষিত হয়েছিলেন। স্যার সৈয়্যদ আহমদকে কাফির হতে হয়েছিল ইংরেজী ভাষা শিক্ষার পক্ষে ওকালতি করে। এমনিভাবে যুগে যুগে সমসাময়িক আলেমরা এক দল আরেক দলকে ফতওয়ার তরবারিতে আঘাত হেনেছে। আসুন এখন নিজ চোখে দেখি কোন সম্প্রদায় কোন্ দলকে কাফির বা অমসুলমান বলে আখ্যা দিয়ে রেখেছে ঃ

বেরেলভী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দেওবন্দীর ফতোয়া ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ছাড়া অপর কাউকে আলেমুল গায়েব (অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত) বলে সাব্যস্ত করে আর আল্লাহ্র সমপর্যায়ে অন্য কারও জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করে, সে নিঃসন্দেহে কাফির। তার ইমামতী, তার সাথে মেলামেশা, তার প্রতি সৌহার্দ্য প্রকাশ সব হারাম" (আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী প্রণীত ফতওয়ায়ে রশিদীয়া কামেল ঃ পৃষ্ঠা ৩২, প্রকাশক মুহাম্মদ সাঈদ ১৮৪৩-১৮৮৪)।

শিয়াদের বিরুদ্ধে দেওবন্দী আলেমদের ফতওয়া ঃ "শিয়ারা কেবল মুরতাদ কাফির আর ইসলাম বহির্ভূতই নয় বরং তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের এমন শত্রু যা অন্যান্য সম্প্রদায়ে কম পাওয়া যাবে। মুসলমানদের এ ধরণের লোকদের সাথে সব রকমের সম্পর্ক ছেদ করা উচিত। বিশেষ করে বিয়ে শাদীর ব্যাপারে (মৌলানা মোহাম্মদ আবুদ্শ শাকুর, লক্ষ্ণৌ থেকে ১৩৪৮ হিজরী সনে প্রকাশিত ফতওয়া)।

আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ফতওয়া ঃ "সত্তর জন দেওবন্দী আলেম কর্তৃক স্বাক্ষরিত ফতওয়া জারী করে তাতে আহলে হাদীস সম্প্রদায়কে কাফির ফতওয়া দেন এবং বলেন যে, তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা তাদের মসজিদে প্রবেশ করতে দেয়া শরীয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ এবং ধর্মের জন্য ফেৎনা ও ভয়ের কারণ" (বিজ্ঞাপন, আবূ আলাই ইলেকট্রিক প্রেস, আগ্রা থেকে প্রকাশিত)।

জামাতে ইসলামী ও এর প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে ফতওয়া ঃ মওদুদী সাহেবের লেখা বই-পুস্তকের উদ্ধৃতি দেখে মনে হতে পারে, তার ধ্যান-ধারণা ইসলাম ধর্মের পথ-নির্দেশক। সমস্ত ইমাম এবং সম্মানিত সব

নবীর শান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে ধৃষ্টতা ও অবমাননায় ভরপুর। তিনি যে নিজে পথভ্রষ্ট ও অপরকে পথভ্রষ্টকারী এতে কোন সন্দেহ নেই। হুযূর আকরম (সঃ) বলেছেন, 'প্রকৃত দাজ্জালের আগমনের পূর্বে আরও ত্রিশজন দাজ্জাল জন্ম দিবে, যারা আসল দাজ্জালের পথ সুগম করবে। আমার জ্ঞান ও ধারণা হতে সেই ত্রিশ দাজ্জালের মাঝে একজন হলো মওদুদী' (মৌলানা মুহাম্মদ সাদেক, মোহতামীম মাদ্রাসা বাহারুল উলুম, করাচী প্রদত্ত ফতওয়া, ২৮ যিলহজ্জ, ১৩৭১ হিজরী)।

সুন্নীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ফতওয়া ঃ আহমদ রেজা খান বেরেলভী এবং তার অনুচর সবাই কাফির। যে তাদেরকে কাফির বলবে না সে-ও কাফির, যে তাদেরকে কাফির বলে সন্দেহ করে সে-ও কাফির (রদ্দুত তফসীর, ১১ পৃষ্ঠা) "গয়ের মোকাল্লেদের চিহ্ন হলো জোরে আমীন বলা, রাফাইয়াদায়েন করা, নামাযে বুকের উপর হাত বাধা, ইমামের পিছনে আলহামদু পড়া, এহেন ব্যক্তিরা সুন্নত জামাত থেকে খারিজ এবং রাফেজী, প্রভৃতি গোমরাহ্ ফিরকার সমতুল্য" (জামেউশ্ শাওয়াহীদ ফি ইখরাজিল ওহাতীনা আনিল মসজিদ)।

শেখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেহবন্দী? আশরাফ আলী থানবী, সৈয়দ হাসান আমরোহীসহ বহু আলেম শিহকাব সাকেব কিতাবে ফতওয়া দিয়েছেন ঃ 'আরবের আব্দুল ওহাব নেযদীর হাতে বহু মুসলমান শহীদ হয়েছেন। সে ছিল অত্যাচারী, বিদ্রোহী রক্তপিপাসু ফাসেক।' শেখুল হাদীস আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী বুখারীর শরাহ্ ফজলুল বারীর ভূমিকায় লিখেছেন, আব্দুল ওহাব নেজদী একজন কম এলেমধারী লোক, এ জন্যই সে কুফুরী হুকুম দিত বেপরোয়াভাবে। উল্লেখ্যযোগ্য, বর্তমান সৌদী আরবের শাসক গোষ্ঠী এ ওহাবী মতাবলম্বী।

মোকাল্লেদদের সম্বন্ধে আহলে হাদীসদের ফতওয়া ঃ "চারি ইমামের অনুসারী চারি তরিকার হানাফী, মালিকী, শাফই, হাম্বলী এবং চিশতিয়া, কাদেরীয়া, নকশাবন্দীয়া, মোজাদ্দেদিয়া প্রভৃতি লোক মুশরিক ও কাফির" (মজমুয়া ফতওয়া ৫৪, ৫৫ পৃষ্ঠা)

বর্তমান যুগের মুসলমানদের মৌদুদী সাহেব বলেছেন, আহলে হাদীস, দেওবন্দী, বেরেলী, শিয়া, সুন্নী প্রভৃতি ফিরকা জাহেলিয়তের উৎপাদন (খুতবা ৭ম সংস্করণ- ৭৬ পৃষ্ঠা)। তিনি জন্মগত মুসলমানদেরকে আহলে কিতাব বা ইহুদী খৃষ্টানদের অনুরূপ বলে উল্লেখ করেছেন (সিয়াসি কশমকশ, ৩য় খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা)। তিনি তার জামাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার অর্থ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া বলেছেন" (রোয়েদাদ জামাতে ইসলামী, ১ম সংস্করণ ৮ পৃষ্ঠা)।

এর বিপক্ষ সুন্নী আলেমগণ ফতওয়া দিয়েছেন 'মৌদুদীর জামাত একটি গোমরাহ্ জামাত। এদের আকায়েদ আহলে সুন্নত জামাত ও কুরআনের এবং হাদীসের খেলাফ" (মৌলানা হোসেন আহমদ মদনী)।

"মৌদুদী পন্থীদের পিছনে নামায পড়া মকরূহ তাহরীমা" (মৌলানা মাহ্দী হাসান, মুফতী দেওবন্দ ও এ ব্যাপারে আরো দু'হাজার আলেমের দস্তখত আছে, দেখুন মৌদুদী জামাতের স্বরূপ পুস্তিকায়)।

"মুফতী মাহমুদ মৌলানা মৌদুদীকে ইসলাম থেকে খারিজ ঘোষণা করে এ ব্যাপারে অন্যদেরও সমর্থন দাবী করেছেন।"

(দৈনিক পূর্বদেশ ১৯/১০/৬৯)।

কাদিয়ানী বা আহমদীদের বিরুদ্ধে ফতওয়া ঃ আল্লামা লুধিয়ানভী বলেন, আহমদীয়া জামাত মুরতাদ সুতরাং তিন দিনের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে হত্যার অবকাশ আছে। আহমদীয়া জামাত যিন্দীক। সুতরাং কোন সুযোগ না দিইে তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে। আহমদীয়া জামাত কুফরীকে ইসলাম বলে চালায়। (কাদিয়ানী এবং অন্যান্য কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য)।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কিছু উলামাদের উস্কানীতে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে কুফুরী ফতওয়া আরোপ করেন। শেষ পর্যন্ত সেই আলেমগণই কুফুরী ফতওয়ায় স্বয়ং ভুট্টো সাহেবকেও ভূষিত করেন। ভুট্টো সাহেবের ভাষায় শুনুন, আমার উপর কুফরের ফতওয়া লাগান হয়েছে। যার জন্য আমার মনের অবস্থা শুধু সেই ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারে, একজন মুসলমান একজন সত্যিকার মুসলমানকে কাফির সাব্যস্ত করলে তার যে অবস্থা হবে তা-ই আমারও হয়েছে" (নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ১৪ নভেম্বর, ১৯৭৪ইং)।

আমরা দেখতেই পাই আলেমরা যুগে যুগে এত ফতওয়া দিয়েছেন যে, আজ আর সাধারণ মানুষ সহজে তাদের ফতওয়ার মূল্য দেয় না। তাদের ফতওয়া কোন কাজ হয় নি তবুও তারা বর্তমানে সরকারী ফতওয়া চান। কিছু দিন পর পর একদল আলেম মাথা চাড়া দিয়ে উঠে বলে, এ দল কে বা সে দলকে সরকারীভাবে কাফের ফতওয়া দেয়া হোক। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল আলেমদের ফতওয়া যদি কোন কাজ না হয়ে থাকে তাহলে কি সরকারী ফতওয়ায় কোন কাজ হতে পারে? পাকিস্তানে আহমদীদের সরকারীভাবে কাফির ফতওয়া দিয়েছিল। কিন্তু তাতে অত্যাচার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া ছাড়া কি কোন লাভ হয়েছে? না. ভুট্টো-জিয়ার সরকারী ফতওয়ার পর সেই আহমদী জামাত তো আরো বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন চিন্তা করা দরকার, সরকার বা কোন সংসদ কি কাউকে মুসলমান বা অমুসলমান ফতওয়া দিতে পারে? ইসলামে কি এ ধরনের কোন ব্যবস্থা আছে? সকল ধর্মের লোক দ্বারা নির্বাচিত সকল মত ও পথের লোক যারা গঠিত সংসদ কি কাউকে কাফির ঘোষণা দিতে পারে? সংসদের ফতওয়ায় যদি কেউ অমুসলমান হয়ে যায়, তাহলে কি তাদের ফতওয়ায় অমুসলমানরা মুসলমান হয়ে যাবে? নানা ধর্মে এবং মতবাদে বিশ্বাসী সাংসদরা কি শরীয়ত অনুযায়ী ফতওয়া দেবার যোগ্য? সাংসদদের সবাই কি শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপন করেন? তারা কি প্রকৃতভাবে আল্ কুরআনের আইন মেনে চলেন? তারা কি শুধু মুসলমানদের ভোটে নির্বাচিত? যাদেরকে তারা অমুসলমান ঘোষণা দিবেন তাদের ভোটে কি সেসব সাংসদ নির্বাচিত হন নি? যাদেরকে কাফির বলা হয় তাদেরকে ভোটে নেয়ার সময় কি পৃথক করা হয়েছিল? যদিও কোন দল শুধু মুসলমানদের ভোটে নির্বাচিত হয় তাহলে কি ইসলামে এমন কোন বিধান আছে যে, কাউকে কাফির আখ্যা দেয়া যায়? (চলবে)

- মুহাম্মদ আহমদ সুমন

বিরুদ্ধবাদীগণ কর্তৃক মিথ্যা দোষারোপের বিরুদ্ধে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেন ঃ

"আমরা ঈমান রাখি যে, খোদাতাআলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লেখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দু মাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলো অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্** এর উপর ঈমান রাখে এবং এ ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ, ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতাআলা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসেবে পুর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, তা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া বা খোদা-ভীতি এবং সততা বিসর্জন নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল যে, আমাদের এ অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এ সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীন-

অর্থাৎ- সাবধান! নিশ্চয় মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত (আইয়ামুস্ সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)।

"আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো ঃ **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্‌তাআলার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তৌফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হলো ঃ আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) হলেন 'খাতামান্ নবীঈন' ও

সৈয়্যদনা হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাউওদ (আঃ)

'খায়রুল মুরসালিন' যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্‌তাআলা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি যে, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আর এ-ও আমাদের বিশ্বাস যে, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সঃ)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

(ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৩৭-১৩৮)

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদাতাআলার উপর ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু** কলেমার উপর আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মানি। আমরা ফিরিশ্‌তা, পুনরুত্থান দিবস (কিয়ামত), জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলা মুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ) 'হারাম' (নিষিদ্ধ) আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' (বৈধ) করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশি করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি- আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি- আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান" ('নূরুল হক' পুস্তক, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫)।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয় সাল্লাম 'খাতামান্ নবীঈন' এবং কুরআন শরীফ 'খাতামুল কুতুব'। এখন আর নতুন কোন কলেমা বা নামায হতে পারে না। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যা কিছু বলেছেন বা করে দেখিয়েছেন এবং কুরআন শরীফে যে শিক্ষা প্রদত্ত এগুলোকে বাদ দিয়ে মুক্তি বা পরিত্রাণ (নাজাত) পাওয়া যাবে না। যে এগুলোকে পরিত্যাগ করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এটি আমাদের মতাদর্শ ও আকীদা" (মলফূযাত, অষ্টম খন্ড, পৃঃ ১৫২)।

"আমি সত্য বলছি এবং খোদাতাআলার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি এবং আমার জামাত মুসলমান। এ জামাত আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও কুরআন করীমের উপর ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমান রাখা উচিত। ইসলাম থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ পদস্খলনকে আমি ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস হলো, এক ব্যক্তি যত কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে পারে, যতটা আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য অর্জনে সক্ষম শুধুমাত্র আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার আনুগত্য ও পূর্ণ প্রেমের মাধ্যমেই সে তা লাভ করতে পারে, তা না হলে নয়। তাঁকে বাদ দিয়ে এখন পুণ্যের আর কোন পথ নেই।" (লেকচার লুধিয়ানা, পৃঃ ১২, মলফূযাত অষ্টম খন্ড, পৃঃ ২২৪-২২৫)

কবিতা

শহীদ শাহ্ আলম স্মরণে ঃ

(দুই)

পবিত্র মাহে রমযানে,
মাহ্দীর অনুসারী, রসূলের প্রিয় বান্দারা
যবে ঘোর নিমগন সিয়াম সাধনে,
মসজিদে মসজিদে
কিংবা গৃহকোণে।
দেখছি দু'চোখ ভরে
অবারিত আল্লাহ্ মিলনের সফল দুয়ার।
ঠিক এ সময়
আল্লাহ্র নাম নিয়ে
জালিমেরা হামলা চালায়,
মাহ্দীর মসজিদে,
রঘুনাথপুর বাগিচায়।
মাহ্দীর অনুসারী রোযাদার ভাইদের উপর,
জালিমের আঘাতে তাই
শাহ্ আলম মাটিতে লুটায়,
সারা দেহে বহে রক্তধার।
আল্লাহ্তে লীন হয় সারা দেহ মন
শাহ্ আলম লাভ করে খোদার দিদার।
জালিমের মাঝে নেই ধর্মের চিহ্ন এতটুকু,
লুটেরা দস্যু ওরা,
জঘন্য ঘৃণীত জীব এই দুনিয়ায়।

রঘুনাথপুর বাসী,
মাহ্দীর সেনানী সকলে,
কি দুর্জয় হিম্মত তোমরা দেখালে!
নির্বোধ চেয়েছিল মাহ্দীর (আঃ)
সেনাদের গতি রুখে দিতে।
তোমাদের কণ্ঠস্বর চিরতরে স্তব্ধ করিতে।
মাহ্দীর মসজিদ
তাদের দখলে নিয়ে যেতে।
তোমাদের ঈমান কেড়ে নিতে।
মুহূর্তে দৃঢ়তায় তোমরা ঘোষিলে,
যায় যাক প্রাণ,
মাহ্দীর মসজিদ
যেতে নাহি দিব কভু
জালিমের জবর দখলে।
জালিমের অত্যাচারে উচ্চ শির
কভু নমিল না।
তোমার ঈমানের জোর
টলিল না এতটুকু।
মাহ্দীর সেনানী সকলে
জালিমের অত্যাচারে পেতে দিলে বুক
মৃত্যুরে বরণ করে নিলে।

প্রতিদিন প্রতি পলে
মরেছে মানুষ,
চাকায় পিষ্ট হয়ে, রোগে শোকে, অস্ত্র আঘাতে
কিংবা দুর্বিপাকে।
শহীদের পুরস্কার ক'জনার ভাগ্যে লেখা থাকে?
রোযা নিয়ে গেলে তুমি খোদার দিদারে,
তোমার ইফতার হলো
আল্লাহ্র খাস দরবারে,

শাহ্ আলম সিপাহ্সালার
হে বিজয়ী বীর!
সত্যের প্রতিবাদী তব কণ্ঠ-ধ্বনি,
পিক কণ্ঠে ওঠে রণরণি।
তুমি আছো আকাশের পাখিদের শান্তি মিছিলে।
রঘুনাথপুরবাগে তুমি আছ,
তোমার রক্তে ফোটা বাগিচার
ফুলে ও ফসলে।

- মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশ্তানাতা

শারাবান তাহুরা

(শহীদ শাহ্ আলম সাহেবকে)

"কফিনে চাদর দিয়ে
ঢেকে দিয়েছ আমার আজন্ম পাপ,
ফুলের পাপড়িতে অভিবাদন জানায় আমাকে
স্বর্গীয় ফিরিশ্তার বিশাল মিছিল।"
"মালায়ে আলায়" চলছে স্বাগতমের ধূম
চাঞ্চল্যে ভরে উঠে মকামে মাহ্মুদ।
রক্তাক্ত পাঞ্জাবী লাল টুপি এঁকেছে স্বর্গের
কাঙ্ক্ষিত রোডম্যাপ, দোদুল্যমান হয়
সিদ্ধান্তের প্রতিটি চিন্তা।
"জয়তুনে" প্রজ্জ্বলিত প্রতিটি শিক্ষার প্রতিচ্ছাপ পড়ে
সরাসরি আমার বোধে-আত্মায়
আমি দেখি প্রেমাস্পদের কাতরতা
তাবৎ আলমের 'শাহ্' হয়ে চলে গেছ
যেখানে কেউ তোমায় দেখবে না
কেউ ছুঁতে পারে না তোমার মকাম
সালেহিয়তের সিঁড়িতো পার করে গিয়েছ
না-রাখা হিসাবের কোনও এক সময়ে।
বিলাপ করে পৃথিবীর সমস্ত আত্মা
যেন তোমার সাথে হত্যা হয়েছে "সমগ্র মানবজাতি।"
প্রণয়ের দ্বারোদ্ঘাটন ঘটে স্রষ্টার সাথে
সরাসরি মিলিত হয় ধনুকের দুই মাথা;
মরেনি, পারে না মরতে, এ সত্যের সামনে
দাঁড়িয়ে আমি দেখেছি প্রকম্পিত গরিমা,
আরশের খোদা আজ বড্ড বিচলিত ---
তোমার স্নানাহার হবে প্রতিদিন স্বর্গীয় ফুলে -ফলে
যা আমরা দেখি নি কখনো
চোখে দেখি নি তার স্বাদ
৩১শে অক্টোবর লেখা হয়ে রইল
আমল নামার প্রতিটি পৃষ্ঠার প্রথমে
ডান হাতে পাওয়া আমল নামায়।

- মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

পুণ্য-গাঁথা

মীর সেকান্দর আলীর
বড় আদুরে কনিষ্ঠ দুলাল
তাঁর স্মৃতি মুছি পালিয়ে
গেল, নির্দয় মহাকাল।
মীর মোবাশ্বের, স্থপতি আচার্য
তাঁর যশস্বী সন্তান।
কোথায় সেই আহমদী,
কোথায় সেই মুসলমান?
মসীহী তেজোদীপ্ত
বুকে ভালবাসা অফুরান।
সরাইলের নক্ষত্র, শিক্ষাবিদ
হাবিব আলী মীর,
তাঁর কথা স্মরণে অন্তর
হয়, শোকে চৌচির।
অমায়িক স্পষ্টভাষী, বন্ধু-
বৎসল ভিতর বাইর অম্লান।
কোথায় সেই আহমদী
কোথায় সেই মুসলমান?
তাঁরা ছিলেন যেন বেহেশ্তের
অধিবাসী, আদি।
ধরার মায়া তাঁদেরে তাই
রাখতে পারে নাই বাঁধি।
গেলেন ফেলে নিজ
বসত বাটী। ভুবনে করি
আলোক দান।
কোথায় সেই আহমদী
কোথায় সেই মুসলমান
মসীহী তেজোদ্দীপ্ত
বুকে ভালবাসা অফুরান।
আমি খুঁজি সেই সচ্চিদানন্দ
সত্যে উৎসর্গীত প্রাণ,
ভুবনে ভুবনে খুঁজি আমি
সেই সত্য-নিষ্ঠ
সত্য-দ্রষ্টা প্রাণ।

- মির্যা আলী আকন্দ

মাননীয় মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিষয় ঃ **আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত নির্যাতন প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন।**

মহাত্মন,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

প্রথমেই আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গত বৃহস্পতিবার রাতে আপনার সকাশে উপস্থিত হয়ে আমাদের জামাতের বিরুদ্ধে পরিচালিত নির্যাতনের বিষয়টি উপস্থাপন করলে আপনি যে তড়িৎ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আপনার মৌখিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি ঃ

(১) পশ্চিম ঢাকার তেজগাঁও থানাস্থ নাখালপাড়া আহমদীয়া মসজিদ দখল করার আন্দোলনে উগ্র ও জঙ্গী মোল্লারা কখনও এক সংগঠনের নামে কখনও বা আরেক সংগঠনের নামে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে 'জায়শে মোস্তাফা' পরে 'ইমাম সংহতি পরিষদ' আবার শেষে 'খতমে নবুওত সমন্বয় কমিটি' নামে তারা রাস্তায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। আপনার নিরপেক্ষ আইনগত সুদৃঢ় অবস্থানের কারণে পুলিশ বাহিনী নিজেদের জীবনের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করেও ২১শে নভেম্বর শুক্রবার সারাদিন এদেরকে প্রতিহত করেছেন। আমাদের আকুল আবেদন, আপনি অনুগ্রহপূর্বক নিজে সরাসরি তত্ত্বাবধান করে আগামী কয়েকদিন এসব সন্ত্রাসীদের জঘন্য কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিহত করার ব্যবস্থা করবেন।

আপনাকে আমরা নিশ্চিত করছি, নাখলপাড়াস্থ আহমদীয়া মসজিদ সংলগ্ন এলাকার পাড়া-প্রতিবেশীরা এই আক্রমণের সাথে জড়িত নয়। তারা শান্তিপ্রিয় ও ভদ্র প্রতিবেশী। বহিরাগত মোল্লারা এখানে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

(২) যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার রঘুনাথপুর বাগ গ্রামে গত ৩১শে অক্টোবর জুমুআর নামাযের পর মৌলভী আমিনুর ও জনৈক শাহীনের নেতৃত্বে আক্রমণ চালানো হয় আমাদের স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদের ইমাম জনাব শাহ্ আলমের উপরে। এর ফলে তিনি নিহত হন। একই ঘটনায় আহত হন জনাব আতিয়ার রহমান ও জনাব আবুল বাশার নামে দু'জন আহমদী। নিহতের স্ত্রী নাজমা বেগম বাদী হয়ে সেদিনই ষোল জনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা করেছেন (ঝিকরগাছা থানার মামলা নং-২১, তারিখ ৩১-১০-০৩)। গ্রামের সাধারণ মানুষ এই জঘন্য ঘটনার সাক্ষী, তারা নিন্দা করেছেন এবং সহমর্মিতাও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই কুচক্রিমহল এই স্পষ্ট মানুষ-হত্যা যজ্ঞকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ষড়যন্ত্রকারীরা ১৭ দিন পরে ঝিকরগাছা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে (মামলা নং-১৫ তারিখ-১৬-১১-০৩)। এই সাজানো মামলায় বলা হয়েছে ৩১শে অক্টোবর দুপুরে চারজন আহমদী নাকি ছিনতাই করেছে। আশ্চর্যের বিষয়, অভিযুক্ত আসামীদের মাঝে মোল্লাদের আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত একজন আহমদীর নামও আছে। আমরা এই জঘন্য হত্যাকান্ডের আসামীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও সুষ্ঠু বিচার দাবী করছি।

(৩) কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানাধীন উত্তর ভবানীপুর গ্রামের ১৭টি আহমদীয়া মুসলিম পরিবার গত প্রায় ২৫ দিন ধরে অবরুদ্ধ। তারা ফসল কাটতে পারছে না, বাজার করতে পারছে না, বাচ্চাদের স্কুলে যেতে দেয়া হয় নি, ৫দিন আগে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে চাপকল তুলে নিয়ে যাওয়ায় তারা খাবার পানি পাচ্ছে না। একাধিক জিডি হয়েছে, ডিসি ও এসপি সাহেবরা একাধিকবার এ গ্রাম পরিদর্শনও করেছেন। কিন্তু সেই গ্রামের জনৈক মৌলভী আব্দুর রাজ্জাক, মৌলভী মোয়াজ্জেম ও জালাল মাতবর প্রশাসনের সদিচ্ছার বিরুদ্ধে এই জঘন্য অমানবিক নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। আমরা আপনার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

মাননীয় মন্ত্রী, আমরা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। আমরা দোয়াতে দৃঢ় বিশ্বাসী। আমরা দোয়া করি মহান আল্লাহ্ যেন আপনাকে সময়োচিত যথাযথ দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়ার তওফীক দেন। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন (আমীন)।

- **প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী**
নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

শহীদ শাহ্ আলমের নামাযে জানাযায় ন্যাশনাল আমীর সাহেবের যোগদান

৩১ অক্টোবর, ২০০৩ইং জুমুআ নামাযের পর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রঘুনাথপুরবাগের প্রেসিডেন্ট জনাব শাহ্ আলম দুষ্কৃতিকারীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)

উল্লেখ, ৩১ অক্টোবর, ২০০৩ইং জুমুআর নামাযের পর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রঘুনাথপুরবাগের প্রেসিডেন্ট জনাব শাহ্ আলম সাহেব সেদিনের ইফতারী সম্পর্কে নিজ বাড়ীর ভিতরের দিকে আহমদী সদস্যদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। ইতোমধ্যে পার্শ্ববর্তী মসজিদের ইমাম আমিনুরের নেতৃত্বে প্রায় ২শ' আড়াই শ' লোক লাঠিসোটা, হকিস্টিকসহ জনাব শাহ্ আলমের বাড়ীতে এসে জনাব শাহ্ আলম সাহেবকে আহমদীয়ত ত্যাগ করার জন্য হুমকী দেয়। জনাব শাহ্ আলম দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। সাথে সাথে আমিনুরের নির্দেশে জনাব শাহ্ আলম ও উপস্থিত আহমদীদের উপর লাঠিপেটা শুরু করে। জনাব শাহ আলম মারাত্মকভাবে আহত হন এবং সেখানে উপস্থিত আরো দু'জন আহমদী আহত হন। আহত শাহ্ আলম সাহেবকে হাসপাতালে নেয়ার পথেও দুষ্কৃতিকারী আমিনুরের লোকজন বাধা সৃষ্টি করে। প্রথমে যশোর সদর হাসপাতাল পরে খুলনা মেডিকেলে নেয়ার পথে জনাব শাহ্ আলম শাহাদত বরণ করেন।

সন্ধ্যায় ঢাকায় টেলিফোনে সংবাদ পেয়ে পরদিন ভোরে মোকাররম ন্যাশনাল আমীর সাহেব তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার রঘুনাথপুরবাগ রওয়ানা হয়ে যান। ন্যাশনাল আমীর সাহেব রঘুনাথপুরবাগ পৌছলে সেখানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। জনাব শাহ্ আলমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার এবং আহমদী ও শত শত অ-আহমদী গ্রামবাসী শোকে মুহ্যমান হয়ে যান। গ্রামবাসী অ-আহমদীরা ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে এ ঘটনাকে ইসলামের কাজ নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং জনাব শাহ্ আলমের হত্যাকারীদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানান।

ন্যাশনাল আমীর সাহেব রঘুনাথপুরবাগ আহমদীদের নির্মিত মসজিদে আসর নামাযের পর উপস্থিত আহমদীদের এবং মরহুমের আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে মরহুমের আত্মত্যাগকে গভীরভাবে স্মরণ করে সকলকে আহমদীয়ত তথা ইসলামের শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আহ্বান জানান। তিনি সর্বাবস্থায় খিলাফতের আনুগত্য

এবং কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে জামাতের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সকলকে অনুরোধ জানান।

পরে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উপস্থিতিতে প্রায় তিন শতাধিক আহমদী ও অ-আহমদীদের অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে শহীদ আলম সাহেবের নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন মুরব্বী সিলসিলাহ্ মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব। পরে মরহুমকে মসজিদের সম্মুখে সমাহিত করা হয়। সেদিনই সন্ধ্যায় হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস্ (আইঃ) ফ্যাক্সের মাধ্যমে ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে জনাব শাহ্ আলমের শাহাদাত বরণে তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার এবং অন্যান্য সকলকে শোক-বার্তা পাঠান ও গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। শোক-বার্তাটি ন্যাশনাল আমীর সাহেব তখনই সকলকে অবহিত করেন।

জনাব শাহ্ আলমের শাহাদত বরণের খবরটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সকল স্থানীয় পত্রিকা এবং ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করে। বিবিসিও খবরটি পরিবেশন করে। ২ নভেম্বর, ২০০৩ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে রঘুনাথপুর বাগে জনাব শাহ্ আলমকে হত্যা করা এবং কুষ্টিয়া জেলার ভেরামারা থানার উত্তর ভবানীপুর গ্রামে ১৭টি আহমদী পরিবারকে রমযান মাসের প্রথমদিকে স্থানীয় মৌলবী আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে নির্যাতনের পূর্বাপর সকল ঘটনা তুলে ধরে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি এবং নিরীহ নির্যাতিত আহমদীদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকারের কাছে আকুল আবেদন জানায়।

- বার্তা সম্পাদক

ঢাকার নাখাল পাড়াস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদ দখলের অপচেষ্টা

গত কয়েকদিন যাবৎ তেজগাঁও রহিম মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজের মসজিদের খতীব হাফেয মাওলানা মাহমুদুল হাসান মুনতাজী উস্কানীমূলক বক্তব্য দিয়ে কয়েকটি ইসলামী দল নিয়ে নাখালপাড়ায় আহমদীদের নির্মিত মসজিদ দখল করার চেষ্টা করে আসছিল। গত ২১ নভেম্বর শুক্রবার পূর্ব-নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী জুমুআর নামাযের পূর্বে মসজিদটি দখল করার চেষ্টা করে। পূর্ব থেকে অবহিত হয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বাহিনী অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে দখলকারীদের আক্রমণকে প্রতিহত করেন। জুমুআর নামাযের পরেও কয়েক হাজার লোক মসজিদটি দখর করার জন্য মসজিদের চতুর্দিক হতে আক্রমণ চালায়। পুলিশ বাহিনী কাটা তারের ব্যারিকেড দিয়ে তাদের প্রতিহত করে। হামলাকারীদের লাটিসোটা ইটপাটকেলের আঘাতে ১৭ জন পুলিশ আহত হয় এবং শতাধিক হামলাকারী দলগুলোর লোকজন আহত হয়। শুক্রবার জুমুআর নামাযের আগে এবং পরে প্রায় ৪ ঘন্টা যাবৎ পুলিশের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া পরে পুলিশ মসজিদ দখলকারীদের তাড়িয়ে দেয়।

বিবিসি-র সাথে সাক্ষাৎকারে জনৈক আক্রমণকারী মৌলবী মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে বলেন যে, অনেক দিন থেকে আহমদীরা মসজিদটি দখল করে আছে। স্থানীয় মুসল্লীদের অভিযোগের ভিত্তিতে তারা মসজিদ দখল করার চেষ্টা করছে। একশ' চৌদ্দ বছর যাবত আহমদীয়তের ইতিহাসে এমন জঘন্য মিথ্যা বানোয়াট কল্পিত-কাহিনী কেউ শুনেছে কিনা আমাদের জানা নেই। উল্লেখ্য গত ১৯৮৭ সন থেকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এলাকার আহমদীদের ৬টি মসজিদ মৌলবীরা দখল করে দিয়েছে আজও আহমদীরা তাদের মসজিদ ফিরে পায় নি।

আমরা ইসলামের শিক্ষায় দেখতে পাই যে, নামায আদায়ের জন্য কয়েকটি শর্তের মধ্যে অন্যতম শর্ত হচ্ছে নামাযের জমিন পবিত্র হতে হবে। ধূয়ে মুছে পরিষ্কার করলে পবিত্র হয় না তা অপবিত্র বা অপবিত্র অর্থ দ্বারা ক্রয় করা হলে তা পবিত্র হবে না। এ কথা আমরা প্রায় আলেম-ওলামাদের কাছে শুনে আসছি। অথচ আজ এ নিজেদের হালাল রোজী-রোজগারের অর্থ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করে তারা নিজেদের ইবাদত করছে তা দখল করার জন্য মৌলবীরা নিরীহ জনসাধারণকে উস্কানী দিচ্ছে। আমাদের প্রশ্ন অন্যদের নির্মাণ করা মসজিদ দখল করে সে মসজিদে নামায পড়লে আল্লাহ্তাআলার কাছে কি তা শুদ্ধ হবে? মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কি কখনো এভাবে অন্যের জায়গা দখল করে মসজিদ বানিয়েছেন না অন্যের উপাসনালয় দখল করেছেন? এরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মত বলে দাবী করে, এরা কার শিক্ষা বাস্তবায়ন করছে? দেশের শান্তি প্রিয় জনসাধারণের কাছে আমাদের প্রশ্ন করা কোন্ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে।

আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি যে, বাংলাদেশের সচেতন বুদ্ধিজীবী মহল, সাংবাদিক, প্রেস মিডিয়া এ অনৈতিক, অনৈসলামিক কার্যকলাপকে নিন্দা জানাচ্ছেন। ইতোমধ্যে জাতীয় বাংলা ইংরেজী দৈনিকগুলো বিষয়টি দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট ব্যাপকভাবে তুলে ধরেছেন। আমরা তাদেরকে সাধুবাদ জানাই।

- বার্তা সম্পাদক

দাফনের পর শহীদ শাহ্ আলম সাহেবের আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত

১৮তম তালীম তরবিয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্তাআলার ফযল ০৯/১১/০৩ইং তারিখ বাদ ফজর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন স্থানীয় কায়েদ এজাজ আহমদ ভুঁইয়া।

০৯/১১/০৩ইং হইতে ১৩/১১/০৩ইং ক্লাস নেয়া হয়। উক্ত ক্লাসে উপস্থিত সংখ্যা খোদ্দাম ১৬, আতফাল ১৫, আনসার ২ জন। মোট ৩৩ জন।

- মাহবুবুর রহমান, সেক্রেটারী ক্রোড়া মজলিস

❑জনাব রজব আলী হাজারী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ সাবিনা বেগম, সাং- গ্রাম ও ডাকঘর - ঘাটুরা, জেলা - ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর বিয়ে জনাব বছির আহমদ-এর পুত্র জনাব মোঃ জাকির হোসেন (হেলাল), সাং- ৯২, মহাখালী, দক্ষিণ পাড়া, ঢাকা-এর সাথে ৮০,০০০/= (আশি হাজার) টাকা মাত্র মোহরানা ধার্যে গত ১৮/০৪/০৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

বিয়ের এলান করেন জনাব মৌঃ দেওয়ান মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন মোয়াল্লেম। ন্যাশনাল রিশতানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। এর রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৮৫/০৩, তারিখ ০৩/১০/০৩।

❑ জনাব মির্যা নূর রহমান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ মর্জিনা বেগম, সাং- দারুত তালেব, সোনা কান্দি, ডাকঘর- ফুলতলা-এর বিয়ে জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ-এর পুত্র জনাব মোবাশ্বের আহমদ, সাং- দারুল হাসেম, শালসিঁড়ি, আহমদনগর, ডাকঘর-ফুলতলা, থানা- বোদা, জেলা- পঞ্চগড়-এর সাথে ৫০,০০১/= (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মাত্র মোহরানা ধার্যে গত ১০/০৯/০৩ তারিখ, রোজ বুধবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদ নগর, দারুল হাসেম মসজিদ এ অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

বিয়ের এলান করেন জনাব মৌঃ ইসরাইল দেওয়ান মোয়াল্লেম (অবসরপ্রাপ্ত)। ন্যাশনাল রিশতানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। এর রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৮৬/০৩, তারিখ ০৩/১০/০৩।

❑ জনাব মজিবর রহমান মন্টু-এর কন্যা মোসাম্মাৎ ফারজানা আক্তার মলি, সাং-উত্তর আহমদী পাড়া, কান্দিপাড়া, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর বিয়ে জনাব শেখ আব্দুল ওয়াহেদ-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ আমীন, সাং- উত্তর আহমদী পাড়া, কান্দিপাড়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ) টাকা মাত্র মোহরানা ধার্যে গত ২১/০৯/০৩ তারিখ,

শুভ বিবাহ

রোজ রবিবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়াস্থ কন্যার পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

বিয়ের এলান করেন জনাব মুসলিম খন্দকার, পিতা- মরহুম আঃ ওয়াহেদ খন্দকার। ন্যাশনাল রিশতানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। এর রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৮৭/০৩, তারিখ ১০/১০/০৩।

❑মরহুম মাজেদ আলী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ নুসরাত জাহান রুলী, সাং- ১৫৪/১, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা-এর বিয়ে জনাব ফয়েজ উল্লাহ্‌ খান-এর পুত্র জনাব গোলাম কাউছাইন সাং- মাতিয়া, হাতিয়া আবদালপুর, জেলা- কুষ্টিয়া এর ৬০,০০১/= (ষাট হাজার এক) টাকা মাত্র মোহরানা ধার্যে গত ১১/১০/০৩ তারিখ, রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌। ন্যাশনাল রিশতানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। এর রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৮৮/০৩, তারিখ ১৭/১০/০৩।

❑জনাব মোঃ হাফিজ উদ্দিন শাহ্‌-এর কন্যা মোসাম্মাৎ রানুয়ারা খাতুন, সাং- ভাতগাঁও, সুন্দরপুর, কাহারোল, জেলা - দিনাজপুর-এর বিয়ে জনাব মোঃ আব্দুল গফুর-এর পুত্র জনাব মঞ্জুর আহমদ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, উথুলী, জেলা- চুয়াডাঙ্গা এর সাথে ৫০,০০১/= (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মাত্র মোহরানা ধার্যে গত ১১/১০/০৩ তারিখ, রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভাতগাঁও জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়,আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মোয়াল্লেম। ন্যাশনাল রিশতানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। এর রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৮৯/০৩, তারিখ ২২/১০/০৩।

❑ জনাব সাব্বির আহমদ-এর কন্যা মোসাম্মাৎ শামসুন্নাহার বেগম, সাং- বড়চর, ডাকঘর- পানি উমদা, সাং-নবীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ -এর বিয়ে জনাব আবু নসর মোঃ মাসুদ-এর পুত্র জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সাং- বড়চর, ডাকঘর- পানি উমদা,থানা-নবীগঞ্জ, জেলা- হবিগঞ্জ-এর সাথে ১,৫০,০০১/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মাত্র মোহরানা ধার্যে গত ০৯/১০/০৩ তারিখ, রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বড়চরস্থ কন্যার পিতার গৃহে অনুষ্ঠিত হয়,আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

বিয়ের এলান করেন জনাব আবু নসর মোঃ মাসুদ, পিতা-হাজী আঃ সোবহান, বড়চর, হবিগঞ্জ। ন্যাশনাল রিশতানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। এর রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৯০/০৩, তারিখ ২৩/১০/০৩।

এসব বিয়ে সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্‌তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের প্রবীন আহমদী মোহাম্মদ নুরলী মোড়ল সাহেব গত ৩১/১০/০৩ইং রোজ শুক্রবার বেলা ২টায় ভারতের বেলেগাছি জামাইয়ের বাড়িতে থাকা অবস্থায় সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে খুব সহজ, সরল ও নিরীহ আহমদী ছিলেন। মরহুমের ৭৫ বয়স হয়েছিল। আমি মরহুমের মাগফেরাত ও তার পরিবারের সাব্‌রে জমীলের জন্য খাস দোয়ার আবেদন করছি।

- মোহাম্মদ আরিফুর রহিম
মোবাশ্বের মুরব্বী কোর্সের ছাত্র

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP
Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 66 ◆10th Issue November 30, 2003 ◆Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

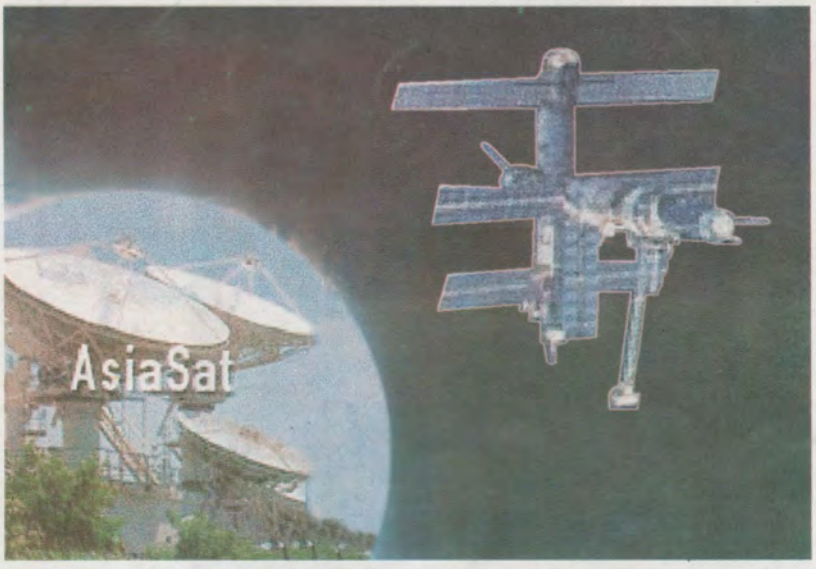

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি **MTA**-র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন রাত ৮টায় বাংলা সম্প্রচার

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 880-2-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com